আউট স্কেচেস

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

৩৬, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ,
কলিকাতা হইতে
কুমারী অনিমা সেনগুপ্তা
কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬, টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর,
কলিকাতা,
কালীতারা প্রেস্
হইতে শ্রীভক্তিভূষণ হাজরা
কর্তৃক মুদ্রিত।

আমার স্বর্গগত
মা এবং জ্যেঠিমাকে

কৈফিয়ৎ

পুস্তকনিবদ্ধ গল্পগুলি আমার তিন-চার বছর আগেকার লেখা। স্বভাবতঃ গল্পগুলিতে যুদ্ধকালবর্ত্তী একটা অনুভাব এসে গেছে। এবং এর প্রায়গুলিতে যে ধরণের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে, আমার অনিচ্ছাকৃত ভাবেই তা' হয়েছে। কারো কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অকারণ হেয় করা আমার অভিপ্রায় নয়।

সাহিত্যিক বা লেখক-জীবনে বাহ্যিক জগতের যে সমস্ত অন্তরায় ও বাধাবিপত্তি এসে জোটে, তা নেহাৎ কিছু অবহেলা করবার নয়। অলক্ষ্যে তৈরী হয় গোপন অশ্রুজলের এক দীর্ঘ ইতিহাস! এমনি ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর অনেকেই রাখেন না। হয় তো রাখবার সুবিধেও হয় না! কিন্তু যাঁরা রাখেন তাঁ'রা বুঝতে পারেন, কত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাঁচিয়ে, কত দুঃখ সংঘাতের ভিতর দিয়ে এ সাহিত্যিক জীবন টিকে থাকে,—বিশেষত বাংলা দেশের পুঁজিহীন দৈন্য-জর্জ্জর সাহিত্যিক জীবন।

গল্পসাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বে কারো ব্যক্তিগত সাহচার্য্য না পেলেও বর্ত্তমান সময়ে আমার এই প্রথম পুস্তক প্রণয়ন করার প্রয়াসে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন—তিনি শ্রদ্ধাস্পদ সুসাহিত্যিক রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। একমাত্র তাঁরই সুচেষ্টার ফলে আজ এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়েছে।

প্রুফ্ সংশোধনে কিছু বানানের ভুলচুক রয়ে গেল। সেগুলি আপাতত মার্জ্জনীয়। আগামী বারের সংস্করণে এ সবের যথাযথ সংশোধনের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। ইতি—

মাণিকগঞ্জ, বেউথা,
বৈশাখী-পূর্ণিমা ১৩৫২ } নী. র. সে. গু.

সূচীপত্র

খাঁটিতে ভেজাল	..	...	১
ট্র্যাজিক	...	...	১২
ছোঁয়াচে রোগ	...	...	১৭
অচল প্রশ্ন	...	...	২২
প্রত্যক্ষ ফল	...	...	২৭
লজ্জা	...	...	৩০
অব্যয়	...	...	৩৪
শনিগ্রহ	...	...	৪০
কর্ত্তব্যনিষ্ঠ	...	...	৪৪
জয়	...	...	৪৭

আউট স্কেচেস

খাঁটিতে ভেজাল

নির্জ্জন বাসর ঘরে নববধূর মুখ দেখিয়া বনোয়ারীলালের সহসা মনে হইল,—কন্যাপক্ষেরি প্রেরিত ফটোখানায় যে মুখ দেখিয়া সে এককালীন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি পাগল-করা মুখ যেন ইহা নয়! কেমন যেন ইহার সঙ্গে সেই ফটোর মুখের তফাৎ! তফাৎ-টিও কম নয়। ইহার রঙটি ত কালো, তা' যতই কেন না পাউডার প্রলেপ দিক্! মুখ? তাহাই বা কি! কোথায় সে টানা টানা ভ্রূ, কোথায় সে আয়ত চোখ, কোথায় সে উদ্ধত নাক? ঠোঁট দুটি ত এত পুরু ছিল না? চিবুকের গঠন? তাহাতেও ত্রুটি! আর কপোলের সেই উজ্জ্বল তিলটি বা কোথায়?...

উহু, ঠকাইয়াছে। নির্ঘাৎ জুয়াচুরি!

বনোয়ারীর মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল।

নববধূটি কপট নিদ্রায় ছিল,—ঠেলিয়া দিতেই চোখ মেলিয়া চাহিল।

: কিগো, তোমার নাম—? একটু রূঢ় ভাবেই প্রশ্নটা করিল বনোয়ারী।

নববধূ শুনিয়া নির্বাক্! ইহা নিশ্চয়ই আদরের ভাষা নয়। কিছু উদ্বিগ্নও হইল, বলিল: কেন, আমার নাম ত নবনী...

: নবনী, কোন্ নবনী—? সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারীর জেরা।

নববধূ বিপদে পড়িল। কত জন নবনী আর আছে এখানে? এক সে, আর...না, আর ত দেখিতেছে না!

চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বনোয়ারী পর্দ্দা চড়াইল: কি, উত্তর দিলে না যে! আমি বল্‌ছি এ নবনী খাঁটি, না ভেজাল?

নববধূ বনোয়ারীর মেজাজ আর কথাবার্ত্তার ধরণে সহজেই ঘাবড়াইয়া গেল। বুঝিতে পারিল না, বনোয়ারীর এমনি কুৎসিৎ ধারণা কোথা হইতে হইল? সে যত দূর জানে, সে-ই একমাত্র খাঁটি নবনী। দ্বিতীয় আর কেহ আছে নাকি?

সে পূর্ব্ববৎ মৌনভাবে একটা বালিসের প্রান্তে মুখ গুঁজিয়া একটা অজানিত ভয়ে শঙ্কিত হইতে লাগিল।

বনোয়ারী সেদিকে তাকাইবার প্রয়োজন মনে করিল না। গলা তেমনি চড়াইয়া বলিল: বলি, একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে রইলে যে!…জানি, এর উত্তর নেই, তার দেবে কি! ইনি যে সে শর্ম্মা নন্ যে তার চোখকে সহজেই ধূলো দিয়ে উঠ্‌তে পারবে! ফাঁকি এখানে চলে না, বুঝ্‌লে? যত্তো সব জুটেছে—! আচ্ছা বেশ, থাক তুমি এ বিছানাতেই শুয়ে, আমি অন্যত্র যাচ্ছি। আমি এর একটা বিহিত না করে—বলিতে বলিতে সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নববধূ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনে শুধু এই চিন্তা, এ কি হইল, এ কি হইল!

বিবাহ-বাটীতে পরদিন সকাল বেলায় বরযাত্রীদের মধ্যে হট্টগোল বাধিয়া গেল!…

বনোয়ারীর পিতা জীবিত নাই। খুড়ামহাশয় কর্ত্তা। তিনিই বিবাহ করাইতেছেন। মেয়েও তিনি দেখিয়াছেন। পছন্দ হইয়াছে বলিয়া তিনি ছেলেকেও যাইয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। আজকালকার স্বাধীন-চেতা সব ছেলে, মেয়েকে দেখিবার তাহারও প্রয়োজন আছে বৈকি। শেষটায় কোথা দিয়া মেয়ে খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে, আর অমনি যত দোষ খুড়ামহাশয়ের ঘাড়ে। খুড়ামহাশয় ইহা চান না।

সুতরাং বনোয়ারীকে তিনি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বনোয়ারী কিন্তু রাজী হয় নাই। হাসিয়া বলিয়াছিল: কাকাবাবু, আপনার চোখ দুটো ত আজো অক্ষয় হয়েই আছে! আপনার দেখ্‌তেই সব দেখা হয়ে গেছে।

খুড়ামহাশয়ের কথাটা ভাল লাগিল। ছেলেটার বিশ্বাস যে তাঁহার উপর আজো আছে, ভাবিতেই একটা আত্মপ্রসাদে ভরিয়া গেলেন। তবু তিনি মেয়ে-পক্ষ হইতে মেয়ের একটা ফটো চাহিয়া পাঠাইলেন,—যাহাতে ছেলে চক্ষু মনের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

ফটো আসিল। দেখিয়া বনোয়ারী আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, হাঁ, এই বয়সেও খুড়ামহাশয়ের একটা রুচিজ্ঞান আছে বটে!

তখন হইতে, বলিতে গেলে, বনোয়ারী তাহার সমস্ত কাজে কর্ম্মে ফটোটি একপ্রকার বুকে বুকে করিয়াই রাখিল। কিন্তু সেই বুকের ধন আজ এ কি!...

প্রথমে খুড়ামশাই বল্লভবাবু কথাটা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাও কি কখনো সম্ভব যে বিবাহের মেয়ে লইয়া ছেলে-খেলাও কেহ করিতে পারে! একজনের পরিবর্ত্তে আর একজন—?

: না, না, আপনি হাস্‌বেন না, কাকাবাবু,—বনোয়ারী সিরিয়াস্ ভাবে বলিল: যা সত্যি, তাই বল্লুম। ফটোটা আন্‌তে ভুলে গেছি, থাক্‌লে তবে—

: দরকার কি,—বল্লভবাবু কহিলেন, দরকার কি লাল? নিজের চোখে দেখেই ত পছন্দ করে গেছি, সে চেহারা কি সহজেই ভুলে যাবার—?

বনোয়ারীর প্রধান বন্ধু সঞ্জীব কিছু অধৈর্য্যের সঙ্গে বলিল: তা হলে তাই যান্ না, আবার দেখে আসুন গে। কাল রাতের মুখ-

চন্দ্রিকার সময় আমারও কেমন সন্দ সন্দ লাগ্‌লো। তা, তোকেও বলি বন্, তুই নিজেও ত তখন আর চোখ বুজে ছিলে নে? বল্লেই ত পার্‌তিস্, এ মুখ, অন্য মুখ খাঁটি নয়—

ঃ কোথাকার একটা গাধা।—অজয় বিরক্তিতে বলিল: তাই কেউ কখনো পারে—অমনি বিয়েব সভায়?…তুই পার্‌তিস্?

ঃ না পার্‌লে চল্‌বে কেন?—সঞ্জীব শান্তভাবেই বলিল: চিরদিন যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে,—সুখে দুঃখে, পতনে-উত্থানে—সেখানে গোড়াতেই একদম ফাঁকির ব্যাপার হয়ে পড়লে সারা জীবনটাই যে ফাঁক্ হয়ে যাবে ব্রদর।

বনোয়ারী কথাটায় সায় দিল: সাঃটেন্‌লি—

ঃ তবেই দেখ,—সঞ্জীব বলিয়া চলিল: আমাদের তা হলে প্রথমেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যখনি বিয়ের সভায় ঘোমটা থেকে মুখটি বেরুলো, তখনই বনের—

ঃ আরে দ্যুৎ, বন্ তখন কি করবে? বিরক্তিতে এবার বাধা দিয়া বনোয়ারী বলিল: তখন কি আমার মাঝে আমি ছিলাম নাকি? সামনে একটা জ্যান্ত অপরিচিত মেয়ে, তার চাদ্দিকে উৎসুক নানা ছেলেমেয়ের চোখ, ঢাকের বাদ্যি,—সব মিলে তখন বুকে আমার কি প্যাল্‌পিটিশন, বাপ্‌স্—

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে কেহ না হাসিয়া পারিল না।

বল্লভবাবু চলিয়া গেলেন।

বাসি-বিবাহ সকাল দশটার মধ্যেই সারিয়া দিবার কথা। বেলা তিনটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, এইই একটা ঠিক হইয়া আছে। কিন্তু এখন যে সমস্যা দাঁড়াইল, যদি তাহা প্রকৃতই হয়, তবে বিপদ্ বাড়িবার বা উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভাবিতে ভাবিতে বল্লভ বাবু ভিতর মহলে আসিলেন।

সেখানেও একটা হট্টগোল চলিয়াছে মেয়ে পুরুষে।

বল্লভবাবু আসিতেই যেন সব চুপ হইয়া গেল। যেন কোথাও কিছু হয় নাই।

কন্যাপক্ষের কর্ত্তা পলুবাবু,—পলাশকানন কাননগু। ইনি কন্যার আপন মামা। তিনিই অগ্রসর হইয়া যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে বল্লভবাবুকে সম্বোধন করিলেন: এই যে—। আপনার কাছেই যাব যাব ভাবছিলাম। কিন্তু এ সব কি বলুন ত? আপনাদের ছেলে নাকি কাল গভীর রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে! এমনি একটা কচি মেয়ে, তায় ঘরে একটী জন নেই। আর দিন কালও যা পড়েছে! একটা যদি হয়েই যেত কিছু, তখন কি কাণ্ডটা হোতো. ভেবে দেখুন দিকি মশাই!

মেয়ের মুখটি আবার দেখা চাই। সেজন্য বল্লভবাবু মুখে কিছু না বলিয়া ঘাড়টা ঈষৎ কাত করিলেন; যাহার এখানে কোন অর্থ নাই।

: তবেই বুঝুন—পলুবাবু ইহাতেই কিছু একটা খুঁজিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন: কি আক্কেলটা হলো আপনাদের ছেলের! ভাগ্যিস মেয়েটা বুদ্ধি করে আমার ঘরে চলে এসেছে, তবেই না—। এসে যে কি কান্না তা কি আর বল্‌বো মশাই! রাত ভর ঘুম নেই। এইমাত্র মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে, আসছি। উঃ, সে এক ব্যাপার! তা যাক্ এবার সব খোলসা করে বলুন দিকি, ঘটনা কি হোলো—

বল্লভবাবু, কি হইয়াছে, তাহাই বোধ হয় গুছাইয়া বলিতে যাইতে-ছিলেন,—তাহার পূর্বেই তাঁহার ঠিক ঘাড়ের কাছ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল: ভেজাল ঘি মশাই, ভেজাল ঘি! যাকে বলে স্রেফ্ জোচ্চুরী, বুঝ্‌লেন?

বল্লভবাবু পেছন ফিরিয়া দেখিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র, অজয়, বরুণ এবং আরো-জনকুই একটি কোন্ সময়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পলুবাবু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন : তার মানে—?

: ভেজালের মানে খুঁজছেন?—সঞ্জীব কৃত্রিম গাম্ভীর্যে কহিল : এই যাকে বলে খাঁটি নয়। মিথ্যা, জাল, ফাঁকি, এ সবও বলা যেতে পারে। আর যারা এমন করে বেড়ায়, তাদের বলে—

: আঃ, তুই কি কচ্ছিস্ জীব, অসহিষ্ণুভাবে অজয় বলিল : বড্ড বাড়াবাড়ি! আগে আবার একটা দেখে শুনে—

: কিছু দরকার নেই, সঞ্জীব উদ্ধতভাবে বলিল : বন এমন কিছু মিথ্যে দেখে না! তার চোখ আমাদের চেয়েও প্রখর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি…

: তা হোক,—বরুণ এবার বলিল : তবু দিনের আলোকে আর একবার হয়ে যাক্ না, সঞ্জীব বাবু।

পলুবাবু কিছুই বুঝিলেন না। বনোয়ারীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহাদের মেয়ে আর কিছুই বলে নাই। আর বলিবেই বা কি!…তবু এই লইয়াই ঘরে নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু কারণ কেহ খুঁজিয়া পায় নাই।

পলুবাবু চাহিয়া আছেন দেখিয়া বল্লভবাবু বুঝিলেন যে লোকটা হয়ত কিছুই জানে না, বা বুঝে নাই। তিনি আসল ব্যাপারটা ভাংগিয়া বলিলেন।

পলুবাবু শুনিয়া খুব গম্ভীর হইলেন। শেষে মৃদুভাবেই বলিলেন : বেশ, আপনারা তবে আবার দেখুন গিয়ে। কিন্তু সে ফটোটি নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে?

ফটো নাই। কিন্তু সঞ্জীব সে-মুখ দেখিয়াছে ইহাই জানান হইল।

: বেশ ওতেই হবে।…আচ্ছা, আপনারা একটু দাঁড়ান্। আমি

যাবো আর আস্‌বো। বলিতে বলিতে তিনি অন্য এক ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কিছু পরেই ফিরিয়া আসিয়া একটা গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন: হ্যাঁ, দেখুন, অনুগ্রহ করে আপনাদের আরো একটু দাঁড়াতে হবে। মাত্র দুটো কথা। আমি বলছিলাম,—এই যে আমাদের পঞ্চভূতের দেহ,—যাকে সব সময়ে রক্ষা করছে পুষ্টিকর খাদ্য, জল আর বায়ু,—এই তিনটের মধ্যে আজকাল আমরা কি পাচ্ছি? প্রথম ধরুন গে চাল। কলে ছেঁটে এসে মিশলো কাঁকরে। তারপর জলে ধুয়ে আগুনে ফুটিয়ে নেয়া। হোলো উপাদেয় ভাত। খেয়ে দু'দিন পরে কি গুণ বেরুল,—না অজীর্ণ আর বেরীবেরী। ডাক্তার দেখে বললেন, ভাত যা খাচ্ছেন তা' মিথ্যে। মিথ্যে মানে মিথ্যে নয়, ভাত ঠিকই আছে, গুণ নেই। গুণ মিশেছে ওই ভেজালে। তারপর ধরুন, দুধ। জল মিশিয়ে সেখানেও গুণকে মেরে ফেলা হয়েছে। তবু কিন্তু সে দুধই। খাবার জলেও এই ব্যাপার। ডাক্তারি ওষুধে খাঁটি জলকে পিউরিফাই করে তবে রোগের বীজাণুর হাত থেকে বাঁচতে হবে। তবু আশ্চর্য এই যে, তাতেও রোগ সারে না। ঊর্ধ্বগামী বায়ুতেও কলের চিম্‌নির ধোঁয়া! ফুসফুস্‌কে ঠিক চল্‌তে দেয় না। এখন দেখুন, বস্তুগুলি কিন্তু সবই খাঁটি আছে, আবার খাঁটিও নেই, সুতরাং হ্যাঁ, এইবার আপনারা সবাই আসুন আমার সঙ্গে—

কৌতূহলাক্রান্ত বল্লভবাবু আর সঞ্জীবের দল ছায়াছবির মত তাঁহার অনুগামী হইল।

একটি চৌকির উপর একটি বৌ শুইয়া ঘুমাইতেছে।

পলুবাবু তাহার মাথার কাপড় সরাইয়া ফেলিতে সকলে দেখিতে পাইল, কাল রাতে বনোয়ারী যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, এ সেই।

পরিষ্কার দিনের আলোকে মুখখানি সুন্দর বলিয়া মনে হইল না।

কাল রাতে উজ্জ্বলালোকে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহার যেন এক অংশ-ও নয়।

বল্লভবাবু আর সঞ্জীব ভাবিল, বনোয়ারী ঠিক বলিয়াছে। মুখটা খাঁটি নয়।

: সুতরাং এখানেও খাঁটি নেই,—পলুবাবু নির্লিপ্তভাবে বলিয়া গেলেন। তবু বল্‌বো, এইটিও খাঁটি। ভেজাল যেখানে মিশান হয়েছে, এই দেখুন—বলিতে বলিতে তিনি পকেট হইতে একটি ফটো বাহির করিলেন।

বল্লভবাবু আর সঞ্জীব অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল। হাঁ, এই মুখই বটে!

পলুবাবু নিজেকে কিছু দৃঢ় করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন: বল্লভবাবু, আপনিই না এখানে এসে এ'মুখ দেখে পছন্দ করেছিলেন? আর সঞ্জীব বাবু, আপনি বোধ হয় এ ফটো আপনার বন্ধুর কাছে দেখে থাকবেন। আপনাদের এমনি দেখার মাঝে রয়েছে মস্ত ফাঁকি। হাঁ, এ কথা বলতে আর বাধা নেই যে ফাঁকির কাজটা আমা দ্বারাই হয়েছে,—মানে করতে হোলো। মানুষ মাত্রই সুন্দরকে চায়। কোন অচল বা কুশ্রী বস্তুকে যদি কিছু রঙ্‌টঙ্‌ দিয়ে সচল বলে চালিয়ে দেয়া যায়, তা হলে ব্যবসাদারদের লাভটা একবার দেখুন! ধরা পড়লে অবশ্যি ব্যবসাদারদের ক্ষতি কিন্তু আমি ত আর সত্যই ব্যবসাদার নই...কি বলুন?

পলুবাবু যেন কত বড় রসিকতাই করিলেন এমনি ভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

বরযাত্রীর দল মুখ কালো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পলুবাবু হাসি থামাইয়া লইলেন। মুখ যথোচিত গম্ভীর করিয়া বলিলেন: না না, বড্ড অন্যায় হচ্ছে—বুঝতে পারছি। তবু বলার যা আছে, বলতেই হবে। বল্লভবাবু যাকে দেখেছিলেন, তিনি সত্যই

খাঁটি। ভেজাল মিশেছিল ওর মুখে। একজন আর্টিষ্ট ডেকে তখন ওর মুখকে মেক্ আপ্ করা হয়েছিল। আর সঞ্জীব বাবুও ফটো যা দেখেছেন তাতে ছিল ফটোগ্রাফারের কেরামতি। দু'জনেই খুব ঠকে গেছেন। আর একজন ঠকেছেন, আমাদের জামাই। কাউকে ঠকাতেই আমরা চাই নে, কিন্তু যা দিন কাল পড়েছে তাতে বাধ্য হয়েই—

সঞ্জীব আর থাকিতে পারিল না, চটিয়া উঠিয়া বলিল : থামুন, খুব হয়েছে। লোকের সঙ্গে চিট্ ক'রে আবার কথা। গরু মেরে জুতো দানের ব্যবস্থাটা না করলেই আমরা খুসী হবো। যাক্ র্ফাকি, আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোন কথা নেই, ছেলেকে এ সব বলে রাজী করাতে যদি পারেন, তবে করুন গে। আয় রে তোরা…আসুন কাকাবাবু…

পলুবাবু অসহায়ের মত আরো একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন,—বলিলেন : দেশের খাদ্য, জলবায়ু যখন আমরা মেনেই নিচ্ছি, ভেজাল বলে আর ফেলে রাখছি নে, তখন সামান্য কিছু ভেজাল চালিয়ে আমাদের এখানে যদি কিছু সুবিধে হয়, এটা কি আপনারা একটুও বিবেচনা করবেন না, সঞ্জীববাবু ?…

: আমাকে বলা [illegible]প্রয়োজন !…আপনি ছেলেকেই সব বুঝিয়ে বলুন গে—সঞ্জীব সাফ [illegible] দিল

বরযাত্রীর দল বা[illegible] হইয়া [illegible]াসিল

কিছু পরে প[illegible]বাবু ব[illegible]য়ারীর কাছেই গেলেন। কিন্তু না, সে কোন কথাই মানিতে চাহিল না।

পলুবাবু তবু দমিলেন না। বুদ্ধি [illegible]রিয়া তিনি রূপহীন ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ সুস্থির করিয়াছিলেন [illegible]'করিয়া ভাবিয়াছিলেন, তিনি

ইহাতে যদি ধরা পড়িয়াও যান, তবে সময়োচিত যুক্তি দিয়াই তাহার রোধ করিতে পারিবেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই যখন এখন ফাঁসিয়া যাইতে চাহিল, তখন বিপদ্ দেখিলেন। কিন্তু নিজের হাতের চূণকালি নিজের মুখে মাখিবেন, এমন লোক তিনি ন'ন্। সুতরাং তলে তলে বুদ্ধি বাৎলাইতে লাগিলেন।

বিবাহবাড়ীতে একটা হরিষে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

বাসি-বিবাহ হইল না। বরযাত্রী দল নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিল। শুধু কন্যাপক্ষীয়েরা কোন মতে খাওয়া দাওয়া সারিয়া সরিয়া পড়িল।

এমনি একটা গোলমালে বরযাত্রীদের আর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

গ্রামের সামাজিক লোকেরা আসিয়া নানা যুক্তিবুদ্ধি দিতে লাগিলেন।

বরযাত্রী দল অটল!...

আবার রাত্রি আসিয়া পড়িল।

যে ঘরে বরযাত্রীদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল তাহারই এককোণে চৌকির উপর শুইয়া বনোয়ারীলাল নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই হয়ত চিন্তা করিতেছিল।

আশে পাশে প্রিয় বন্ধুরা সমস্ত ভুলিয়া তাস-পাশায় আড্ডা দিতেছে।

এক সময় একটী ছেলে আসিয়া হঠাৎ বনোয়ারীকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেল। কেহ কেহ মুখ তুলিয়া চাহিলেও কিছু মনে করিল না।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

বরযাত্রী দল নিজেরাই ভিন্ন স্থানে রান্নার আয়োজন করিয়াছিল। সেখানেই তাহাদের খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা খুব হইল।

অকস্মাৎ মনে হইল, বনোয়ারী সেই যে গিয়াছে, আর আসে নাই।

সকলের মুখেই একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল। অথচ এমন ত' হইবার কথা নয়। রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। অলক্ষ্যে বরযাত্রীদের মধ্যে তিনজন সাহস করিয়া ভিতরে একটা খোঁজ লইতে আসিল।

আসিয়া দেখিল, বিবাহবাড়ী চারিদিকে নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও একটা আলো পর্য্যন্ত নাই।

একটা খট্‌কা বাধিল। বনোয়ারীকে ডাকিয়া আনিয়া একেবারে গুম্ করিয়া ফেলে নাই ত'! কন্যাপক্ষীয়দের সঙ্গে এখন যা সুবাদ চলিতেছে!

সমস্ত বাড়ীটায় পাক দিয়া তিনজনে দক্ষিণ দিকের ঘরটার কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলিতেছে!

একটা পুরুষের চাপা কণ্ঠ যেন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার ভঙ্গিতে থাকিয়া থাকিয়া ঘরের নিস্তব্ধতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে!

নিশীথ রাত্রির সন্ধানীরা কানগুলিকে সজাগ করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কণ্ঠস্বরের মালিককে চেনা গেল। বনোয়ারীলাল!

কার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছে এত রাত্রি অবধি?

তিনজনেই আগ্রহে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু না, আগেই নিজেদের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া লাভ নাই। আড়ালে খোঁজ লইতে হইতেছে!

তিনজনেই ঘরের এক ছিদ্রপথে যাহা উঁকি মারিয়া দেখিল তাহার মর্ম্ম এই:

চৌকির এক কোণে পিল্‌সুজে রক্ষিত উজ্জ্বল বাতিটি জ্বলিতেছে।

ঠিক তাহারই দিকে মুখ করিয়া একটি বধূ মাথার সমস্ত আব্রু ঘুচাইয়া বসিয়া আছে। আর তাহারই কোলের উপর নির্লজ্জভাবে মাথা রাখিয়া শ্রীমান্ বনোয়ারীলাল শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রলাপ বকিতেছে! উভয়েরই হাত দুইটী পরস্পর সংবদ্ধ!...

নিশীথ-সন্ধানীরা নিঃশব্দেই সরিয়া পড়িল।

ট্র্যাজিক্

দীর্ঘ বারো বছর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

উঠিয়াছি এক আত্মীয়ের বাড়ী। এখানে আরো যে আমার আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব আছে, এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু তাহাদের বাড়ী, ঠিকানাই নয়, নামও পর্য্যন্ত মনে নাই।

কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!...

সেই অট্টালিকাশ্রেণী, বস্তী, ট্রাম, বাস্, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী আর অগণ্য জন চলাচল,—হয়তো সবই ঠিক আছে, তবু ঠিক নাই। এই পরিবর্ত্তনের দিক্ কি শুধু আমারই—? হয়তো তাই। দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধান।

সঙ্গীহীন ঘরে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া একদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

বাহির হইয়া পড়িলাম রাস্তায়।

পথ চলিতে লাগিলাম।

আমার দুইপাশে জনতার মিছিল। কত রকমের, কত বিচিত্র

বশে। ধনী হইতে নির্ধন। কত পাগল, খোঁড়া, অন্ধ-বধির আর ভিক্ষুক!

ইহার মধ্যে দৃষ্টি আমার সতর্ক! যদি কোন একটি পরিচিত মুখ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠে!

দীর্ঘ পথ হাঁটিলাম। না, অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

বিশাল মহানগরী, ততোধিক জনারণ্য,—ইহার মধ্যে কি সত্যই দ্বিতীয় আর একটি প্রিয়জনের মুখ আমার ভাগ্যে দেখা ঘটিয়া উঠিবে না? আমার এমনি দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে সবাই কি আমার জীবন-যবনিকার অজানা নেপথ্যে একটির পর একটি ফাঁকি দিয়া সরিয়া গেল?...এমনি সব ভাবিতে লাগিলাম।

সহসা ভাবনা কাটিয়া গেল। দেখিলাম, আমি একটা ছোট জনতার মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছি।

ভিতরে একটা লম্বা, শীর্ণকান্তি লোক একমনে খড়ি দিয়া পার্শ্বস্থ দেয়ালের গায়ে কি একটা আঁকিতেছে।

লোকটার গায়ে একটা জীর্ণ আলখাল্লা, স্থানে স্থানে ফাটল ধরিয়াছে। লোকটা পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া মুখ দেখা গেল না। কাঁধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত তৈলহীন দীর্ঘ, এলোমেলো চুল।

মিনিট দুয়েক বাদে লোকটি আপনি ফিরিয়া তাকাইল। ভারী গলায় বলিল: Yes, আবি হুয়া...it's quite right, নিকালো রুপেয়া। পঁচাশ রুপেয়া,...নট্ এ পাই কমতি,...ঝট্‌পট্ নিকালো..., বলিয়া তাহার শীর্ণ বাঁ হাতটি বাড়াইল একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কিন্তু এক পা পিছাইয়া, দূর পাগ্‌লা বলিয়া হাসিতে লাগিল। এবার লোকটার মুখ দেখিয়া লইলাম। সমস্ত মুখ দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন। নাকটি খাড়া। গর্ত্তে পড়া চোখ দুইটি ইঁদুরের

চাহনির মত জল্‌জল্ করিতেছে। ডানদিকের রোমহীন ভ্রূ ঘেঁষিয়া একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন!

পাগল শুনিয়া লোকটা ক্ষেপিয়া গেল না, বলিল: হাঁ-হাঁ, জরুর পাগ্‌লা হ্যায়! হাম্ ভি পাগ্‌লা আছে, তুম্ ভি পাগ্‌লা আছে, দুনিয়া ভি পাগ্‌লা আছে!—বলিয়া হা-হা করিয়া উদ্ভট হাসি যুড়িয়া দিল!

ক্যাপা কোথাকার!

লোকগুলি হাসিতে হাসিতে একটি একটি করিয়া ভিড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল, রহিয়া গেলাম শুধু একা আমি।

পাগল তখন বলিতেছে: কি ফাদার, তুমি আর কেন? সরে পড়। এ গোশালা নয়, বিনোদ আর্টিষ্ট-কা ষ্টুডিয়ো! বুঝলে? তোমার মত পচা ধ্যাধ্বেড়ে মডেল হাম্ নেহিঁ মাংতা,—ভাগ্—

চমকাইয়া উঠিলাম। সেই আমাদের বিনোদ,—বিনোদ আর্টিষ্ট!

তাই ত, এতক্ষণ চেনা চেনা মনে হইয়াও চিনিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এক্ষণে ছুটিয়া গিয়া তার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম: বিনোদ, বিনোদ—তুই! তোর এই অবস্থা?

বিনোদ কিছু অপ্রস্তুত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই রাগিয়া গিয়া বলিল: কিয়া অবস্থা? অবস্থা হামসে তোম্‌ভি আচ্ছা হ্যায়? হাম্ বিনোদ সর্ব্বাধিকারী, F.R.C.A. London, রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়, চারঠো কুট্‌ঠি হ্যায়, দশঠো Ford হ্যায়, তোম্‌ভি কোন্ হ্যায়?… চুনোপুঁটি…ছোঃ—

তাহার কথায় কান না দিয়া তেমনি ভাবে বলিতে লাগিলাম: বিনোদ ভাই, কথা শোন্। পাগলামো করিস্ নে। আমাকে চিন্‌তে পারছিস্ নে! আমি যে তোদের জগরে,…জগদীশ,—মনে নেই?

নাম শুনিয়া বিনোদ এবার যেন আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ

চাহিল! কতক্ষণ তাকাইয়া রহিল। শেষে অকস্মাৎ হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া তাচ্ছিল্যভাবে কহিল: ভাগ্, জগদীশ না কচু! জগদীশ হওয়া অত সস্তা নয়, বুঝলে চাঁদ?

: বিশ্বাস কর্,—আমি জোর দিয়া বলিলাম, বিশ্বাস কর্ বিনোদ, আমি তোদের জগদীশ! অনেক কাল ত আর দেখা নেই। একদম্ ভুলে গেছিস। আমি ডাক্তারি পাশ কর্‌তেই না তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি? তুই তখন আর্ট স্কুলে ফোর্থ ইয়ারে। আমি গেলাম বাইরে এক কাজ নিয়ে, আর তুই তখন স্বপ্ন দেখছিস্, তুই বড় একজন আর্টিষ্ট হবি, বিলেত যাবি, দেশের শিল্পকলার উন্নতি করবি, দেশবাসীর শিল্পজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনবি,— মনে করে দেখ তো ঠিক এই কিনা—

বিনোদ চোখ পাকাইয়া বলিল: হুঁ, বিনোদকে মনে করিয়ে দিতে এসেছেন! বিনোদ অমনি ঢের-ঢের সবাইকে পারে, বুঝলে হে জেণ্টলম্যান্! তাকে যে সে লোক পাও নি!

আমি বলিলাম—একটা মনে করিয়ে দাও না শুনি?

পাগল চটিল: কাহে দেগা—। তুম্‌ভি কোন হ্যায়? মেরা প্যারীজান?

না, একেবারে বদ্ধ পাগল। নিরাশ ভাবে বলিলাম: প্যারীজান নইরে, তোর বন্ধু! এখনো চিন্‌তে পারলি নে বিনোদ?

Oh! my frend, sweet friend! বিনোদ আবৃত্তির ভঙ্গিতে কহিল: What's your name my friend?···Yes, yes, আবি মালুম থা', you জগদীশ। Good congratulations···বলিয়া হঠাৎ সে একেবারে জল হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

আমি আশাতীত আনন্দে ভরিয়া গেলাম। যাক্, এতক্ষণে পাগলাটার মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে!

আমিও তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কষিয়া মৰ্দ্দন করিলাম।

পাগলটা হো-হো করিয়া এক চোট হাসিয়া লইয়া বলিল : একটা সিগারেট খাওয়াতে পারিস জগ••• ?

: Why not ?—বলিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া একটি তাহার হাতে দিয়া আর একটি আমিও লইলাম।

পাগলের মুখ চক্‌চক্ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, অনেক দিন এ বস্তু বুঝি হাতে পড়ে নাই !

আরো একটু ঘন হইবার আশায় কহিলাম : কিছু খাবি বিনোদ ?

পাগল লাফাইয়া উঠিল : সার্‌টেন্‌লি ! উঃ, যা ক্ষিদে ! দু'দিন খাইনি—

অগত্যা রেস্তোঁরার উদ্দেশে আসিতে হইল। পাগলের স্বভাব গেল না। অনর্গল বকিতে লাগিল। তাহার অর্থ এই, দেশের লোক শিল্পী জাতটাকে চিনিল না! শিল্পেরও কেহ কোন মূল্য দেয় না। দেশ একটি নিকৃষ্ট রুচিতে ভরা। এমনি যদি চলিতে থাকে, তবে একদিন সমস্ত দেশ শিক্ষা, সভ্যতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া পশুরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি !

দুইজনে হাত ধরাধরি অবস্থায় চলিয়াছিলাম। হঠাৎ পেছনে একটা টান পড়িবার মত হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিতে হইল। মুখ ঘুরাইয়া দেখিলাম, পাগল আমার হাতের উপর দুই পাটি দন্ত প্রবলভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে।

তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিলাম। পাগলও আমাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিল। আঃ বাঁচিলাম !

পাগল আমাকে ছাড়িয়া দিয়াই পেছন পথে ফিরিয়া মরিয়ার মত

ছুটিতে লাগিল। এ আবার কি হইল! অবাক হইয়া কারণ খুঁজিতে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, দুইজন পুলিশ প্রহরী ঠিক আমার সামনেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট বোঝা গেল।

হাসিব না কাঁদিব ভাবিয়া পাইলাম না।

পাগলটা চোর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর যেন কখনও আমি প্রশ্রয় না দেই,—এইরূপ সাধু উক্তি করিয়া পুলিশ প্রহরীদ্বয় প্রস্থান করিল।

একটা করুণ সহানুভূতির সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম এত দিন পরে যদি একজন জুটিল,—শেষটায় তাহার পরিণতি দাঁড়াইল কি এই?

ছোঁয়াচে রোগ

চারিদিকে যুদ্ধ চলিতেছে।

ঠিক এই সময়ে টাউনের অল্পবিস্তর প্রায় সকলকেই এক ছোঁয়াচে রোগে পাইয়া বসিল।

সামাজিক মাতব্বর ডাক্তারেরা নানাপ্রকার দেখিয়া শুনিয়া মত প্রকাশ করিলেন: এমনি হইবেই, উহার প্রতিকার এখন বড় নাই।

কথাটায় কান না দিলেও সত্যই উপায় বড় কেহ দেখে না। জানিয়া শুনিয়া একটা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখে সকলেই যেন নিজেদের দেহ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছে।

ইতিমধ্যে মরিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

মরাটা কিছু বিচিত্র আর অদ্ভুত হইলেও কাহাকেও যেন বিস্মিত করে না। কারণ, ইহার ফল যে এমনি হইবে, সকলেই জানিয়া বসিয়া

আছে। এই পাঁচ মিনিট আগে যাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল, হঠাৎ শোনা গেল, কোন্ ফাঁকে তাহার জীবনীশক্তি নাকি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। সে মারা পড়িয়াছে।

তবে বিস্ময়েরও আছে। যে-বাড়ীর যে-লোকটি মরিল, সেই বাড়ীর প্রায় অন্য সকলকেও পূর্ব্বগামীর অনুগমন করিতে দেখা যায়।

অদ্ভুত রোগ।

কেহ কেহ ডাক্তারদেরই সুপারিশে দেশরক্ষককে সমস্ত জানাইলেন —যাহাতে একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়।

দেশরক্ষকের কর্ণে হয়ত প্রবিষ্ট হইল কিন্তু মরমে পশিল না।

শুধু বলিলেন: মহৎ ব্যাপার! আচ্ছা, আমি দেখছি!

তিনি কি দেখিবেন,—আলোচনা চলিতে লাগিল ঘরে ঘরে। তাহাদের মনে আর বিশ্বাস নাই, কিন্তু নিরুপায়!...

এদিকে লোক মরিতে লাগিল।

মৃত্যু দেখিলে উদাসীন ব্যক্তিদেরও চিন্তা বাড়ে।

সেদিন পথে মন্মথবাবু পাড়ারই রাজেনবাবুকে ঠিক এই কথাই পাড়িলেন, বলিলেন: তাই ত হে ভায়া, বড়ই মুস্কিল হ'ল দেখছি! এই এক ঘর ছেলেপুলে নিয়ে কি করি বল ত'?

রাজেন বাবুরও ঠিক ওই কথা। সুতরাং কি করিতে হইবে, বলিতে পারিলেন না। শুধু ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি সংকেত করিলেন,—অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন।

মন্মথবাবু অতি দুঃখেও হাসিলেন, কহিলেন: কিন্তু জান ত', কলিকাল! ধর্ম্ম যে এক পো'। ওখানেও বিশ্বাস নেই ভায়া!

তবু বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই, এই চরম মোক্ষ কথা তাহাকে জানাইয়া রাজেনবাবু তখনকার মত প্রস্থান করিলেন।

মন্মথবাবু ভাবিতভাবে পথ ধরিলেন।

খুব বেশী আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইল সেইদিন, যেদিন শোনা গেল, বিপুল বাবুর বাড়ীতেও ছোঁয়াচে রোগ ঢুকিয়াছে।

বিপুলবাবু অবস্থাপন্ন ধনী মানী লোক। অর্থাৎ কোন প্রকার রোগ-শোক ঢুকিলে তাহার চিকিৎসা বা প্রতিকার করিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। জলের মত অজস্র ব্যয় করিয়া বসেন।

ইহার ঘরে আবার ডাক্তারি-শাস্ত্রে অসাধ্য ছোঁয়াচে রোগটা কেন হইল তাহার সন্ধান লইতে জানা গেল, যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া বিপুল বাবুর বিপুল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা একরূপ রাতারাতি ফেল মারিয়াছে। লোকটি ধর্ম্মপ্রাণ আর বিশ্বাসপ্রবণ। হইলে কি হইবে, স্বকর্ম্মচারীরা তাহার মূল্য রাখিতে পারে নাই। একদা সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং লাখপতি বিপুলবাবুও ডুবিয়াছেন। এমনি ডুবিবার সময় বুঝিয়াই হয়ত তাহার ঘরে অমনি ছোঁয়াচে রোগ!

বিপুলবাবুর সদা-হাসি মুখ গম্ভীর। রোগ যখন ঢুকিয়াছে, তখন কোথা দিয়া একটা বিপদ্ ঘটিবেই!

একদিন দেখা গেল, তিনি স্বয়ং বাজার হইতে ভিটামিনযুক্ত বস্তুগুলি বাছিয়া বাছিয়া কিনিয়া লইতেছেন।

পরেশ কাছে যাইয়া একটু সংকোচের সঙ্গে হেতুটা প্রশ্ন করিয়া জানিবে মনে করিতেছিল,—তাহার আগেই বিপুলবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাছে টানিয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন: আর বলো না দাদা, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা! তিনি যা করেন—বুঝ্‌লে কিনা—

পরেশ বুঝিল। তবু না বলিয়া পারিল না: তাই ব'লে আপনার এ কাজ ঠাকুরদা'—?

ক্ষতি কি ? কাজের কি অভাব আছে দাদা, করলেই হ'ল— বিপুলবাবু কিছু সাত্ত্বিক ভাবে বলিলেন : দেখ না আরো কত কি গোবিন্দ কপালে লিখেছেন।...এই ত, ছোট ছেলেটির আজ ক'দিন থেকে জ্বর। দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। ডাক্তার দেখে শুনে বললেন, দেহে ভাইটামিনের অভাব। যুদ্ধের বাজার, তায় ওষুধপত্তরেরও যা' দাম, জান ত দাদা, আর কেনবার উপায় নেই। ডাক্তার তাই সোজা পথ দেখালেন। বল্‌লেন বাজারে যান, ওখানেই সব পেয়ে যাবেন। তাই আসা। চাকব বাকব দিয়ে কি এ সব কাজ—,বল না দাদা ?

ঠিক কথা! দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ভিটামিনের অভাব। সত্যই ইহা যে ছোঁয়াচে রোগের সর্ব্ব লক্ষণ। কিন্তু চিকিৎসার ধারায় কুলাইবে কিনা বলা যায় না।

শুধু ধনঞ্জয় বোস বড় হাসিতেছিলেন। লোকটা সাম্প্রতিক যুদ্ধের বাজারে কণ্টাক্ট বিজনেস মোটা রকমের দাঁও মারিয়া ফুলিয়াছে। একমাত্র ইহারই বাড়ীতে ছোঁযাচে রোগটি ঢুকিতে পারে নাই। হাসিটি ইঁহাকেই, না রোগগ্রস্ত অন্যান্য লোককে উপলক্ষ করিয়া কদলী প্রদর্শন বুঝা যায না।

হঠাৎ হাসিটায় ভাটা পড়িয়া গেল, যখন দেশরক্ষক ভূতের মতন তাহার ঘাড়ে চাপিয়া আসিয়া বলিলেন : ওয়েল মিষ্টার ভোস, তোমাকেই তো হলে এর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে! ঘরে-ঘরে যখন এই অবস্থা, তখন একমাত্র তুমিই তার প্রতিকার করতে পার। তোমার ত আর অভাব নেই শুনতে পাই।

শুনিয়া ধনঞ্জয় বোসের চোখ বড় বড় হইয়া গিয়াছে : বলেন কি স্যর্!...এতগুলো লোকের ব্যবস্থা...না, না, সে কি ক'রে সম্ভব হয়,

তাই বলুন ? দেশে আরো কত বড় বড় মহাজন রয়েছেন, আপনারা রয়েছেন—

: বটেই ত' হে, দেশরক্ষক ধনঞ্জয় বোসের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন : তারাও দেবে, তোমাকেও দিতে হবে। নইলে তোমারই দেশের লোক ত' আর এমনি মরতে পারে না ?···বুঝে দেখ !

ধনঞ্জয় বোস কি বুঝিলেন তাহা বলিবার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে তাঁহাকে ব্যবস্থায় আসিতে হইল। লোকগুলি যদি বাঁচে।

দেশরক্ষকের সহযোগিতা করাতে বাধা রহিল না।

যাঁহার হাত দিয়া ছোঁয়াচে রোগটার প্রতিষেধকের জন্য বিধি নিয়মে সাহায্য পাঠান হইল তিনি তাঁহার কাজ করিতে লাগিলেন।

কালি-কলমে, হিসাবের খাতায়, সংবাদ-পত্রে আর গভর্ণমেণ্ট গেজেটে,—সহরবাসীদের রোগ প্রতিকারের সুব্যবস্থা, দেশের জন্য প্রকৃত উপকার ও আত্মোৎসর্গ, এমনি সব টাটকা—চমকপ্রদ খবর প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধনঞ্জয় বোস আর দেশরক্ষকের নাম দুইটি পাশাপাশি ছাপাইয়া বাহির হইতে থাকে আজকাল।

দেখিয়া দেখিয়া বিদেশী লোকেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একদিন ধনঞ্জয় বোস দেশরক্ষককে নূতন করিয়া এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া উভয়ের সম্বন্ধটা আরো প্রগাঢ় করিয়া তুলিলেন।

এদিকে সহরে তেমনি ছোঁয়াচে রোগে লোক মরিতেই লাগিল।

অচল প্রশ্ন

নিত্য বৈকালিক প্রথামত কথা হইতেছিল হরদয়াল খুড়োর বহির্বাটীতে।

সংবাদ-পত্রের মারফৎ প্রায়ই ভারতবর্ষের অচল অবস্থার কথা পড়িয়া পড়িয়া খুড়ো এক সময় বিরক্তভাবে মত পোষণ করিলেন: ছুত্তোর ছাই, আসমুদ্র হিমাচল ঘেরা গোটা ভারতেরই যদি এই অবস্থা, সেখানে আমরা ত একটা চুনোপুঁটি! যাকে বলে সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে অচল আমরা এই সংসারে,— খেতে-শুতে, উঠ্তে-বস্তে, কাজে-কর্ম্মে, ধনে-ধর্ম্মে, আমোদে-প্রমোদে যা বল! এই অচলায়তনের আবর্ত্তে আর বাঁচতে হচ্ছে না, ভায়া, মরেই রেহাই নাই।···

অটল ছেলেটী বিশেষ কিছুই করে না। বাপের অন্ন ধ্বংস করাই তাহার পেশা। সে-ই বলিল: যা বলেছ খুড়ো! অচলে অচলে গায়ে একেবারে বাত ধরিয়ে দিলে। এই দেখ না, কদ্দিন থেকে একটু মাংস খাব, মাংস খাব বলে স্বাদ গেছে, তা বাড়ীতে শোন গে রোজ এক কথা, আজ-না কাল! এই কাল-কাল করে কাল আর আস্ছে না, আর আসবে এমন ভরসাও কম; কেননা, অঙ্কের ঘর শূন্য!···কাজেই এই চিন্তায় চিন্তায় অচল হয়ে বিছানায় কাত, আর অমনি দেখ পিঠে কেমন বাত,···বলিতে বলিতে সে পিঠের দিকে একবার হাত দিল। বিনোদ অটলের বন্ধু মানুষ। কিছুদিন বেকার, অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় সেই সব কারণেই মনটা কিছু উগ্র হইয়াই ছিল; এখন দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল: যাঃ যাঃ, আর ফাজলামো করিস্ নে অটা! তোর আবার চিন্তা, তাতে হ'ল বাত! মাংস ত তোরা রোজ খাচ্ছিস শুনতে পাই! ঘরে এখনো দুটো পয়সা আছে কিনা, তাই সত্যকে মিথ্যে বলতে আর বাধে

না। যাদের কাজ নেই আর ঘরে পয়সা নেই, তাদের যে দুঃখ, তা' তোর মত মুখ্‌খুর বোঝার কম্ম নয়। বুঝলি?

অটল প্রতিবাদে চটিয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, হরদয়াল খুড়ো তাহাকে হাত দিয়া থামাইয়া কহিলেন: না, না, ভায়া, রাগ করো না, দেখতেই ত পাচ্ছ, তোমার বন্ধুবরটীর মন ভাল নেই। শেষটায় কি একটা কুরুক্ষেত্র বাধাবে? আমি বলি, এ বাজারে দুঃখ কারো কম নয়। এই দেখ না বয়েস হয়েছে, দুটো পূজো-আচ্চা, ধর্ম্ম কর্ম্ম করবো, তা' দেখ গে, টাকার অভাবে সব অচল হয়ে বসে আছে! তোমাদের খুড়ী বলেন; দুটো যে ঘরে এখনো জুটছে এই ঢের, ধম্ম-কম্ম এখন সিকেয় তোলা থাক্‌। আমি বলি: বেশ, তাই যেন হ'ল, কিন্তু পরকালে গিয়ে কি জবাব দেব? যমের ঘরে গিয়ে ঘানি ত আর বইতে পারবো না? খুড়ী উত্তরে বললেন: দরকার কি! জবাব দেবে, যে রাজত্বে আমাদের নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন দয়াময়, সেখানে শুধু খাওয়া জোটাতেই জীবন যায়, তোমার নাম করবার অবসর থাকে না!...

জনার্দ্দন ঘোষ এতক্ষণ শুধু নির্ব্বিকার চোখ বুজিয়া নল-ওয়ালা ফারসী হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন, খুড়োর কথায় কোথায় রস পাইয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন: মার্ভেলাস্‌!.. সনাতন হালদার সমালোচক মানুষ। বিশেষতঃ জনার্দ্দন ঘোষ একবার মুখে কিছু বলিলেই হইল! তিনি তখন ফরাসের একধারে আড় ভাবে শুইয়া দুইদিনের পুরানো খবরের কাগজ উল্টাইতেছিলেন, জনার্দ্দনের কথাটা কানে ঢুকিতেই উঠিয়া বসিয়া ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন: মার্ভেলাস্‌টা হ'লো কিসে? খুড়ী গোপনে দুই এক কাপ্‌ বেশী দেয় নাকি?

জনার্দ্দন ঘোষ মুখের নল সরাইয়া চোখ পাকাইয়া বলিলেন: হালদার, তোর কি মরলে বুদ্ধি হবে রে? চক্ষুলজ্জা নেই?

সনাতন ইহার ধার দিয়াও গেলেন না, বলিলেন : সত্যি কথায় হালদারের লজ্জা হয় না, এ ত' তুমি অনেকদিন জান ঘোষ মশাই! নইলে খুড়ো যা বলেছেন, তাকি আমাদের দেশে সকল মানুষের জীবনেই খাটে? এমন অনেক লোকও ত এখনো আছে যারা খাওয়ার চিন্তা করে না, অথচ ধম্ম-কম্ম বলে তাদের কোন বালাই-ই নেই। দিব্যি নাস্তিক সেজে বিলাস-তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছে! এই যেমন বস্তি-পাড়ার নরেন লাহিড়ী!···খুড়োই বলুক, কেমন, ঠিক কিনা?

হরদয়াল খুড়ো তাকিয়াতে হেলান দিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন : যা বলেছ ভায়া! বেটা মরলেও যমে ছোঁবে না। শুনেছি ওর পরিবারটি নাকি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। অনেক চেষ্টা করছে ওকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু ওর দুর্ম্মতি! আরো শুনছি নাকি, এখন একেবারে ঘর ছেড়েছে,···একটা মহা বিশ্ব-বকাটে!···

: বটে, এত দূর! সনাতন ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিলেন।

: ক্ষতি কি! বিনোদ কিছু নির্লিপ্তভাবে বলিল : আমাদের মত ত অভাবের দুঃখে নেই!···আছে, যেমনি হোক্ ওড়াচ্ছে! ইহ-জগতে যে সুখের স্বর্গ হাতে হাতে পাচ্ছে, পরকালে গিয়ে সে কি পাবে না পাবে, সে চিন্তা তার না হওয়াই স্বাভাবিক!

: নরেনটা এমনি সব বলে বেড়ায় বটে, খুড়ো বলিলেন : বলে, খুড়ো, তোমাদের পরজগৎ ত শুনেছি একটা অন্ধকারে ভরা। আলোর ছিঁটেফোঁটা বল্‌তে যেটুকু আছে, সে [illegible] মুক্ত সাধুপুরুষদের জন্যে। আমরা ত' চেষ্টা করেও এখন সে দলে [illegible] পারবো না,—তাই সাধু যদি না হলুম, তবে হলুম বা খারাপ! আবার যখন খারাপের কোন ষ্ট্যান্‌ডার্ড নেই, তখন একেবারে খারাপের চূড়ান্ত করাই ভাল। অন্ততঃ তা'তে যদি ইহ-লৌকিক সুখের প্রাচুর্য্য মেশে। তারপর পরকালে যদি

অন্ধকারেই ফিরে বেড়াতে হয় ত তাও ভি আচ্ছা।...কথাটা শোন একবার আহাম্মকের !

সনাতন কহিলেন ঃ ওর ঐ রকম কথা, জানি ত! একেবারে এই জমাট পার্থিব সুখে সুখেই নরকে পচ্‌বে, দেখো। বেটা অসংযমী... উচ্ছৃঙ্খল...

এই সময় একটি লোক প্রবেশ করিল। দেখিয়া সকলেই যেন চমকাইয়া উঠিল।

লোকটি সকলেরই পরিচিত। পাড়ারই রমানাথ। লোকটি গরীব হইলেও বরাবরই চরিত্রবান্ ও ধার্মিক! কথা বেশী বলে না। বলিলেও অতি প্রয়োজনে। সম্প্রতি যুদ্ধের বাজারে তাহাকে বড় বেশী কাহিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাও তাহার অন্তরঙ্গ ছাড়া বড় কেহ জানে না। এমনি চাপা ছিল রমানাথ।

রমানাথের আবির্ভাবের প্রথমেই চোখ পড়ে তাহার মুখে। মাথার দীর্ঘ রুক্ষ চুল চারিদিকে এলোমেলো ভাবে পাগলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকদিন ক্ষৌরকর্মাভাবে এক মুখ দাড়ি-গোঁফ। চোখ দুইটি গর্তে। গাল ভাঙিয়া গিয়া নাকের দুইপাশে গভীর খাঁজ পড়িয়াছে। দেহের পোষাক-পরিচ্ছদও তদনুরূপ। জামাটায় বিস্তর তালি পড়িলেও বেশী জীর্ণত্বে স্থানে স্থানে নূতন করিয়া ফাটল ধরিয়াছে। সব মিলিয়া যেন গাঁজাখোরাকৃতি !...

আসিয়াই লোকটা [illegible] কোণ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরদয়াল খুড়োই বলিলেন ঃ রমানাথ, কিছু বলবে ?

রমানাথ মাথা নিচু করিয়া অস্ফুট ভাবে বলিল ঃ আজ্ঞে,... এদিকে একটু আসুন

হরদয়াল উঠিয়া গেলেন। রমানাথ ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল।

শুনিয়া মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল হরদয়ালের। তিনি আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন: অ্যাঁ,...কী সর্বনাশ! দুইটিই মারা গেছে।

রমানাথ তেমনই ঘাড় গুঁজিয়া এবার স্ফুট ভাবেই বলিল: হ্যাঁ,... পনেরো দিনের উপর না খাওয়া এক রকম! হতভাগা আমি, জোটাতে কিছুই পারলুম না। শেষটায় মেয়ে-বৌ নিজেরাই কোথা থেকে কিছু আফিং জোগাড় করে এই কাণ্ড ঘটালে!...এখন বলুন আমি কি করি?

ব্যাপারটা বুঝিতে আর বাকী রহিল না!

জনার্দ্দন ঘোষ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন: হারামজাদা, বাড়ীতে না খেতে পেয়ে আফিং খেয়ে মেয়ে-বৌ একসঙ্গে মরে গেল, আর তাই তুমি এসেছ কিনা এখানে এখন নবাবপুত্তুরের মত জানাতে! আর বল্‌ছেন কিনা কি করি! কি করবে আর? যাও, যে চক্ষুলজ্জা এত দিন তোমার গৃহধর্ম্ম অচ্ছন্ন করে ছিল তা নিয়েই পড়ে থাক গে। বেটা গোমুখ্যু!

সনাতন হালদার নির্ব্বাক্।...হয়তো ধর্মাধর্মের বিচিত্র গতির কথাই ভাবিতেছিলেন।

আর হরদয়াল খুড়ো স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, লাখপতি নরেন লাহিড়ীর যে সুখ, আর অভাবগ্রস্থ রমানাথের আজ এই যে দুঃখের শোচনীয় পরিণতি, উভয়ের মূলে কি ভারতের অচল অবস্থা নয়?

প্রত্যক্ষ ফল

সংসারে টাকার অভাব ছিল না। গাড়ী-বাড়ীও ছিল।

শুধু অভাব ছিল একটি সন্তানের।

এই হেতু স্বামীস্ত্রীর মনে সুখ আর নাই। সর্বকর্মে ওই চিন্তা।

অবশেষে স্থির একটা হইল যে, স্ব-ভ্রাতার একটি পুত্রকে দত্তক হিসাবে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

শুনিতে পাইয়া প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা বৃন্দা ঠাকরুণ গৃহকর্ত্রী সুলোচনা দেবীর হিতার্থে ধরিয়া পড়িয়া একদিন বলিলেন: বলি, আমার কথাটা একবার শোন বৌমা! কোন দিন ত আর ধম্মে-কম্মে হাত দিলে না, শুধু চিরটা কাল ডাক্তার-বদ্যির অখাদ্য কুখাদ্য গিলেই কাটালে! তা' যাক্, কম্মে যা লেখা আছে, হয়েছে, এবার শোন: আসচে মঙ্গলবার পুজোটা করে ফেলো দিকি!...মা ষষ্ঠীর পুজো। বড় জাগ্রত দেবতা। আগে দিনে এ পুজো না করে ঘরের লক্ষ্মীরা কোন কাজেই হাত দেন নি, জান ত বৌমা! বলে, একটি পুত্রমুখ না দেখ্‌লে অনন্ত নিরয়—। হাতের আগুনটুকু পেলে তবে মুক্তি! তা' তোমরা আজকালকার বৌ-ঝি, বিশ্বাস কর্‌তে চাও না কিছুতে—

সুলোচনা একটু হাসিয়া কিছু কুণ্ঠার সঙ্গে বলিলেন: বিশ্বাস কেন করবো না, ঠাকুমা? তবে কিনা, প্রমাণ একটা চাই ত! এখন, তোমার পুজো করলেই যে সন্তান মিলবে, এমন কথা ত নেই! তবে হ্যাঁ, যদি দেখাতে পার, তবে তোমাকে সত্যি বলছি আমি সোনার মা ষষ্ঠী গড়িয়ে পুজো দেব।

বৃন্দাঠাকরুণ কিছু ভাবিত হইলেন। শেষে ফোক্‌লা মুখে হাসি টানিয়া কহিলেন: না বাছা, তোমার প্রমাণ-নজির আমি দেখাতে

পারব না ! ও বস্তু বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রের কোথাও নেই। আমি বলছি শুধু বিশ্বাস—। কথায় আছে, 'বিশ্বাসে মিলযে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।' তাই যদি মান ত কিছু শোনাতে পারি বৌমা !

সুলোচনা শেষের কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। ভগবানে তাঁহার বিশ্বাস একেবারে যে নাই, এমন নয় তবে তাঁহার এই বিশ্বাসের পথে বড় বাদী ছিলেন নিজের স্বামী গৌরাঙ্গবাবু। তাঁহার মতবাদটা ঠিক নাস্তিকের মত। অনেকটা এই কারণেই, তিনি নিজেও কিছু-কিছু নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রমাণ চাহিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় গতানুগতিক সংস্কারটা অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল বলিয়াই অনেক সময় মুখের সঙ্গে মনের যোগাযোগ বড় মিল খাইতে চাহিত না। ফলতঃ এইখানেই বাধিত যত সংঘর্ষ !···

এই সব ভাবিয়াই এখন সুলোচনা চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বৃন্দা ঠাকরুণকে বিদায় দিলেন এই বলিয়া যে, এ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গবাবুর একটা মত আদায় করিলেই তবে পূজাবিধিতে হাত দিতে তাঁহার বাধিবে না।

দুইদিন পর তিনি বৃন্দা ঠাকরুণকে আবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন। গৌরাঙ্গবাবুর মত হইয়াছে। কথা কাটাকাটি একেবারেই হয় নাই। তাঁহার এই অকস্মাৎ বিরুদ্ধ মতবাদে সবটা মিলিয়া কেমন একটা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় !···

সঠিক মঙ্গলবারেই ষষ্ঠী পূজার আয়োজনের ধূম পড়িয়া গেল। উপকরণ নৈবেদ্যের পরিমাণ খরচটা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশীই ধরা গেল।

আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ বার্তা পাঠান হইয়াছে।

বাত-অপটু হাতে বৃন্দা ঠাকুরুণ যাহা পারিতেছেন, করিতেছেন। আজকের এমনি বিরাট আয়োজনের সম্মান বলিতে গেলে তাঁহারই প্রাপ্য !...

ইতিমধ্যে বাহিরে রাস্তায় সকালবেলা হইতেই যত গরীব কাঙ্গালীদের ভীড় পড়িয়াছে গন্ধে-গন্ধে। উত্তরোত্তর তাহাদের কলরব বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের প্রবেশ-পথে ভোজপুরী দ্বারোয়ান বাধা দিবার চেষ্টা কম করিতেছে না। যেখানে কথায় কোন কাজ চলিতেছে না, সেখানে কিছু লাঠিও তাড়না করিতে হইতেছে। ইহাতেও যখন কুলাইয়া উঠিল না, অগত্যা সে গেট বন্ধ করিয়া খৈনী টিপিতে বসিয়া গেল।

ভিতরে প্রশস্ত বাঁধানো আঙ্গিনায় পূজার কার্য্য চলিতেছে। দোতালার বারান্দায় একপাশে দাঁড়াইয়া গৃহকর্ত্তা গৌরাঙ্গবাবু তাহাই দেখিতেছেন। তাঁহার চোখে মুখে এক প্রচ্ছন্ন বিচিত্র হাসি !...

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক সময় মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি তখনই সুলোচনাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

সুলোচনা উপরে উঠিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইতেই তিনি নিঃশব্দ অঙ্গুলি সংকেতে আঙ্গিনার এক কোণের দিকে দেখাইয়া দিলেন।

সুলোচনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন একটি বয়স্থা ভিখারিণী চারিটি দিগম্বর পুত্রকন্যা সম্মুখে সারি সারি দাঁড় করাইয়া অনিমেষ বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলিয়া পূজা আয়োজনের দিকে তাকাইয়া আছে। ইহার কোলে আরো একটি শীর্ণকায় বছর খানেকের শিশু সন্তান। শুধু তাহাই নয়, সর্ব্বদেহেও যেন আরো একটির আবির্ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট !...

গৌরাঙ্গবাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে কহিলেন: কেমন গো! একবার ঝিকে পাঠিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে খোঁজটা নেবে নাকি যে, এই অভাবে পড়ে বছরের কত বার ও তোমাদের মা-ষষ্ঠীর পূজোর আয়োজন করে বেড়িয়েছে?

কথা শোন একবার!...সুলোচনা দেখিয়া শুনিয়া হাসিবেন না কাঁদিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। কেমন একটা লজ্জাও করিয়া উঠিল।

তবু কি যেন একটা বলিতেও গেলেন, দেখিলেন তাহার পূর্ব্বেই নিঃশব্দে গৌরাঙ্গবাবু আড়াল দিয়াছেন।

নীচে তখন পূজারম্ভে পুরোহিতের সানুনাসিক জীবন্ত বেদমন্ত্র, শঙ্খ-ঘণ্টার সঙ্গে শ্রুত হইতেছে।...

লজ্জা

যাবতীয় ট্রাঙ্ক-সুটকেস ওলট্‌-পালট করিয়া ফেলিলেও কোন একটা ধুতি ও জামা পছন্দ হইয়া উঠিল না।

কল্যাণের যাইতে হইবে কোন একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। বিবাহ ব্যাপার। বিচিত্র পোষাকধারী অনেক প্রকার নরনারীর সমাবেশ ঘটিবে। হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, বিলাতী আবহাওয়ার ছোঁয়াচে এ দেশ এখন আর দৈহিক পোষাকের ঊর্দ্ধে বড় উঠিতে চাহে না। উপরকার ঠাট বজায় রাখিলে তবে নাকি সকলের মন পাওয়া যায়।

সুতরাং ঠাট বজায় রাখা কল্যাণেরও দরকার। অবস্থা তাহার অস্ত্রাণের দিকে গেলেও বাজারে এমন কিছু হাঁকডাক কম নয়।

ললাটে বিত্ত না থাকিলেও যশের তিলক কিছু ছিল। সে সাহিত্যিক, কবি। এই হেতু বড় বড় দরবার হইতে তাহাব সাদর নিমন্ত্রণ-লিপি আসিত। আসিত,—মন্দ ছিল না, কিন্তু ওই একটা গোলমাল বাধিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া। ধুতি-জামার গোলমাল। ভাল একটি ধুতি যদি মিলিত, জামা মিলিত না। জামা মিলিলে, ধুতি নাই।

আজ যদি বা ধুতি মিলিয়াছে, জামা আর কিছুতে পছন্দ বা মিলিযা উঠিতে চাহিল না। কিন্তু ওদিকে বিবাহের লগ্ন হইয়া আসিল, আর বিলম্ব মোটেই সমুচিত নয়। অথচ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিবার উপায় তাহার ছিল না। বিবাহ-বাসরে তাহার একটা অভিনন্দন-লিপি পাঠ করার কথা!

অবশেষে স্ত্রীর বুদ্ধিতে একটা সমাধান হইল।

জামাটার উপর একটা দামী সিল্কের আলোয়ান জড়াইয়া সে বাহির হইযা পড়িল। কবি বা সাহিত্যিকদের উপযুক্ত সাজ। তবু মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

না, বিবাহ-বাসরে যেমন হইবে কল্যাণ ভাবিয়াছিল, তেমন কিছুই হইল না। অন্ততঃ আমন্ত্রিতদের চোখে একটা কেউ কেটা হইয়া দেখা না গেলেও কবি-সাহিত্যিকের উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা সে পাইয়াছে। সিল্কের আলোয়ানটাই বলিতে গেলে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। আলোয়ানটা সত্যই দামী। আট বছর আগে বিবাহেব যৌতুক স্বরূপ তাহারি এক খুড়শ্বশুর মশাই চুরাশী টাকা খরচে এইটি দিয়াছিলেন। কিছুকাল হইল ঘন ঘন ব্যবহারে কিছু জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু টাকাও গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার মূল্য কমিয়া যায় নাই! এখন কম-সে কম গোটা চল্লিশ টাকাও ত বটেই!...

নিমন্ত্রণ সারিয়া বাহির হইতে হইতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল।

একাই যাইতে হইবে, কোনরূপ সঙ্গী সাথী পাওয়া গেল না। ট্রাম-বাসেরও সেদিকে যাতায়াত নাই। এক ট্যাক্সি আর রিক্সা। কিন্তু তাহাতেও বিঘ্ন। তদুপযুক্ত ভাড়াও সঙ্গে নাই। অথচ এত অধিক রাত্রিতে হাঁটিয়া যাওয়াও সমুচিত নয়। তবু যাইতেই হইবে—এই ভাবিয়া কল্যাণ পথে নামিয়া পড়িল। একটু ঘুর পথেই চলিল। কিছু বলা যায় না। এই পথটা তবু কিছু সজাগ!

কিন্তু বিপদ্ আসিল। রাজা পরীক্ষিৎ-ও জানিয়া শুনিয়া সাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

বাসার গলির মুখেই কিছু অন্ধকার। দুইদিক্ হইতে দুইটি গুণ্ডা আসিয়া অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

কল্যাণ বাধা দিবে কি, কেমন হকচকাইয়া গেল। কিছু একটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও পারিল না, তাহার আগেই একজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

কল্যাণ সমস্ত নিষ্ফল বুঝিয়া তাহাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

গুণ্ডারা প্রথমে তাহার মূল্যবান্ আলোয়ানটি গা হইতে তুলিয়া লইল। তারপর পকেট না হাতড়াইয়া একেবারে জামাটাই খুলিয়া লইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু হঠাৎ তাহারা সে ইচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া গেল।

আপনারা হয়ত ভাবিবেন, এই সময় কল্যাণ বুঝি কোনরূপ যুযুৎসুর প্যাঁচ কষিয়া বসিয়াছে! কিন্তু না, তাহার কিছুই নয়, কারণ সে ভাল করিয়াই জানে, কলিকাতার গুণ্ডাদের কোনরূপ প্যাঁচ কষিয়াও কাজে আসে না, হয়ত বিপরীত ফল ঘটে। সে যেমনই ছিল ঠিক তেমনি তাহাদের হাতে রহিয়াছে, বরঞ্চ গুণ্ডারাই নূতন প্যাঁচ কষিয়াছে। কষিতে গিয়া দেখিল, প্যাঁচ কষে না,—ফলতঃ

নিজেদের ভাগ্যে কেমন বঞ্চনা ঘটিয়া গেল। এইরূপ হইবে মনে করা গিয়াছিল, তাহারা হয়ত জাতক্রোধে কল্যাণকে রেহাই দিবে না, হয়ত খুনই করিয়া বসিবে, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ কিছুই হইল না! অকস্মাৎ তাহারা হাতের শিকারকে এক গ্যাস-পোষ্টের কাছে টানিয়া ফেলিয়া রাখিয়া একরূপ লজ্জা-বশেই যেন পাশের গলির অন্ধকার গর্ভে ছুটিয়া পালাইয়া গেল!...

কল্যাণ বাঁধন সব খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে সুস্থে উঠিয়া বসিল। না, আর ভয় নাই, বেটারা চলিয়া গিয়াছে। আঘাতও দেহে এমন কিছু বোধ হইতেছে না। খুব ফাঁড়া কাটিয়াছে, ফাঁকিও কম দেওয়া যায় নাই। এক আলোয়ানের উপর দিয়া গিয়াছে, তা যাক্।

কোন্ সময় দুইটী ভদ্রলোক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্যাণ মুখ তুলিতেই চোখাচোখি হইয়া গেল। তাহারা বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে। কেমন যেন একটা সংকোচ হইল। হঠাৎ মাথাটা যেন কেমন হইয়া গেল কল্যাণের— সে তড়াক্ করিয়া দাঁড়াইয়া একটানে সমস্ত গায়ের জামাটা ছিঁড়িয়া টুকরা-টুক্‌রা করিল, তারপর তালগোল পাকাইয়া ভদ্রলোক দুইটির মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া দ্রুত নিজের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।...

গভীর রাত্রির উলঙ্গ নিস্তব্ধতার মধ্যে ভদ্রলোক দুইটী হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন এমন হইল বুঝিতে পারিল না।

অব্যয়

ডাষ্টবিনটাকে কেন্দ্র করিয়া একটা তুমুল কলরব জাগে।

তখনও ভোর হয় নাই। হেমন্ত শেষের একটা বিস্তীর্ণ কুহেলী-ধূসর আবরণ আধ-আলো আধ-অন্ধকারের শূন্যতা ব্যপিয়া যবনিকার মত ঝুলে। দুই একটা ছন্নমতি বিনিদ্র কাকের প্রলাপী কণ্ঠ কাছে কোথাও থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া বেড়ায়!—বোধ হয় আপনার জনদের বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু জানাইয়া দিতে।—হয়ত বলে, হে প্রিয় বন্ধুগণ, আজ একটু সকাল সকাল জাগো; দেশের দিনকালের অবস্থা স্মরণ কর। আজ আর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই। পাড়াটা বড়লোকের।

গত রাত্রে কোন এক রিটায়ার্ড সাবজজ-দুহিতার শুভ-পরিণয় ঘটিয়াছে। আয়োজনে, নিমন্ত্রিতের দলে, দ্বিতীয় রাজসূয় বলিলেই চলে। এমনি বিরাট, এমনি সমারোহ। নিমন্ত্রিত ছাড়াও, অর্থাৎ যারা রবাহূত-অনাহূত,—আসরে ঢুকিবার নানা কৌশল বিস্তার করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বড় সফল হয় নাই। ভিতরে বাহিরে নানা রকমের প্রহরী বসাইয়া, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া, কখনও বা নানা রকম প্রশ্নোত্তর করিয়া তবে তাহাদের ফাঁকিটা ধরা পড়িয়া যায়।

ধরা পড়িয়া রবাহূত-অনাহূতদের মধ্যে তখনো যাহাদের কিছু কাণ্ডজ্ঞান ছিল, তাহারা নিজেদের বঞ্চিত পাকস্থলীকে ততোধিক ক্ষুধা দিয়াই হয়ত বা জয় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল,—যাহাদের সে বালাই ছিল না, তাহারা অন্ধকারের আড়ালে আবডালে ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের মত আশায় আশায় বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়াও কিন্তু তাহাদের সে

আশায় ছাই পড়ে। অবশেষে অনন্যোপায়ে তাহারা প্রাক্তন প্রভুদের পথ অনুসরণ করিয়া যায়।

ভোর না হইতেই কিন্তু এ ভুলটা ধরা গেল। না, তাহারা একেবারে চলিয়া যায় নাই। হয়ত কোথাও সাময়িক আড়াল দিয়াছিল মাত্র, এখন প্রত্যক্ষ করা গেল, তাহাদেরই কতক জন নিকটের ডাষ্টবিনটাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া আছে! কলরবটা তাহাদেরই। কুহেলী-ঘন আবছায়ার মধ্যে তাহাদের মূর্তিগুলি যেন একটি-একটি অশরীরী ছায়া, আর কলরবগুলিও যেন বাস্তবকে স্পর্শ করে না।

ডাষ্টবিনটা রাতারাতি ভরিয়া উঠিলেও পদার্থের চেয়ে যেন অপদার্থই বেশী।

দেখিয়া শুনিয়া এক সময় প্রসাদ রাগ করিয়া বলিয়া উঠে : শালা, দেখেছিস কাণ্ড! খেয়েছে যেন তেলেপোকা। হাড়ের ভেতরের রসটুকু পর্য্যন্ত বাদ যায় নি!

একমনে একটা মাটির মালসাতে খাওয়ার যোগ্য বস্তুগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলে সাধুরাম : সে-ই বলে : খাবে না!...দিনকালটা আর দেখছিস নে? বলি, সবার ঘরই যে এখন ঢু-ঢুঁ বাবা, লক্ষ্মীঠাকরুণ কুপোকাৎ—

প্রসাদ নিজেও এ সব জানে। জানিলে হইবে কি, পেট জানে না। একদিন ওখানে কিছু ফাঁক পড়িয়াছে কি, অমনি জান শুদ্ধ বুঝি চিচিং ফাঁক,...বাপরে বাপ—

ইতিমধ্যে ফুলির মা মন্দ যোগাড় করে নাই। ইহারা তিনজন। বছর বারোর একটি মেয়ে, আর একটি ছেলে বছর আটেকের। মেয়েটার নামই ফুলী। মেয়েটি কালো আর রোগা। মুখে কিন্তু লালিত্য দেখা যায়, হয়ত' ভুল,—তবু বয়স একটা বাড়িতেছে।

ছেলেটা একটা কলার পাত লইয়া পড়িয়াছে। চাটিয়া-পুটিয়া কিছুই নাই, শুধু পাতাটাই এখন বাকী,·· দেখিয়া দেখিয়া মার বোধ হয় আর সহ্য হয় না, বলিয়া উঠে ঃ তোর জ্বালায় কি আমি মরবো র‍্যা ?···একটু যদি বোঝে ! একশো বার বল্‌ছি, হতভাগা, খুরীতে ক'রে তরকারীগুলো ছেঁকে ছেঁকে তোল,···সোন্দর হয়েছে তরকারীটা,·· তা' নি একবার শোনে ?···এমন ছেলে নিয়ে আমি কি করি—

ফুলী ভাঙ্গা মাছের টুক্‌রাগুলি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া একটা শূন্য দৈয়ের হাঁড়িতে তুলিয়া লইতেছে ; দেখিয়া খাইবার ইচ্ছাও তাহার কম হয় নাই। কিন্তু মায়ের ওই শাসন—। তবু ভাইয়ের হইয়া সে যেন সহানুভূতি না দেখাইয়া পরিল না, বলে ঃ আহাঃ, তুমি যেন একটা কী, মা,—একটুও বোঝ না ! দুদিন ও কি কিছু খেয়েছে নাকি ?

ঃ না খেয়েছে, খেয়েছে,—ফুলীর মা তাড়িয়া বলে ঃ সময় দেখতে হবে না র‍্যা ? এ সব এখন হাতছাড়া হ'লে আর কি ও পাবে ?

কথাটা ফেল্‌না নয়। তবু ফুলী বুঝিতে চায় না।

মেয়ের সঙ্গে মায়ের এই লইয়া বাদাবাদি চলিতে থাকে। ইহাদের মত আরো অনেকের মধ্যে ঠিক এমনি কথা-ঝামেলা চলিয়াছে। কোলাহল ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সময়ও বাড়িতেছে। অকস্মাৎ দুইটি কুকুরের মুহুর্মুহু চিৎকারে সকলেই সেদিকে মুখ তুলিয়া চায়। দেখে কুকুর দুইটি তাহাদেরই সঙ্গে হয়ত একত্রে ভাগসাম্য রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নেংটি পরা জগা পাগলাটা তাহার মোটা লাঠির আঘাতে উহাদের বঞ্চিত করিতে চাহিলে সহসা কুকুরদ্বয় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে। তাহাই দেখিয়া পাগলটা মাঝে মাঝে [illegible]তেছে, কখনো বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। অথচ আশ্চর্য্য এই,

এমনি ইতস্ততঃ ছড়ানো রাজসিক খাদ্য-খোরাকের প্রতি তাহার লোভ নাই।

কয়েক জন মন্তব্য করে: পাগল, পাগল আর কাকে বলে!

অদূরে একটা বয়স্থা স্ত্রীলোক বসিয়া নির্লিপ্ত চাহিয়া চাহিয়া এই সব দেখিতেছে। বোধ এই দলে নূতন ভিড়িয়াছে। মাথায় বিবর্ণ শাড়ীটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া,—ইহার মধ্য দিয়া গোছা গোছা রুক্ষ চুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চোখ মুখও কেমন ফুলা ফুলা। হয়ত রাতে ঘুমাইতে পারে নাই।

দেহের ঊর্ধ্বপ্রদেশটটা একেবারে খুলিয়া ফেলিয়া দেড় বছরের একটি শিশুকে মাই ধরাইয়া দিয়াছে সে।

এই সময় একটা লোক কাছে আসে। লোকটা শ্রীনাথ। ইহার চেহারাটা ঠিক ভিক্ষাজীবী বা পথচারীদের মত নয়। বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে গেলেও এই দুর্দ্দিন বা অনাহারের ক্লিষ্টতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। চুলগুলি অবশ্য বড় বড়; শ্রীহীন, দাড়িও গজাইয়াছে একমুখ; তবু ইহারই মধ্যে বড় বড় দুইটা চোখ আর খাঁড়ার মত নাসাটি অষ্টপ্রহর পাহারা দিতেছে। আসিয়াই শ্রীনাথ মেয়েলোকটির পার্শ্বে রক্ষিত মাটির ভাঁড়ে কি কতকগুলি খাদ্য নির্ব্বিকার ঢালিয়া দেয়, তারপর স্বরটা নরম করিয়া বলে: নে, খা—আর গোলমাল করিস্ নে, বুঝলি?

মেয়েলোকটা একবার ফিরিয়া চায় মাত্র। হয়ত মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে কিন্তু এমনি কিছু বলে না।

বুভুক্ষুদলের কেহ কেহ শ্রীনাথের এমনি উদারতা চাহিয়া দেখে,—কেহ বা মুচকিয়া হাসে। অর্থ—তোমাকে আমরা অনেক চিনই

জানি হে ঘুঘুরাম! তলে তলে দাঁও মারিয়া বেড়াও পথের যা-তা ফলারে তোমার মুখ রুচে না!··

প্রসাদ সাধুরামের কানে কানে এই কথা পরিষ্কার জানায়।

সাধুরাম সাধুর মত শুনিয়া শুধু হাসিতে থাকে।

কুহেলী কাটিয়া যায়। গাছে গাছে সোনালী রৌদ্র নববধূর মত ঘোম্‌টা তুলিয়া চায়! রাস্তার জনতা, যানবাহন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। অকস্মাৎ মিউনিসিপাল আবর্জ্জনা ফেলার গাড়ীগুলি আসিয়া পড়াতে বুভুক্ষু দলের ভাংগন ধরে। তাহারা অন্যত্র নিরিবিলি আশ্রয়ের খোঁজে বাহির হইয়া পড়ে।···

আবার রাত্রি ফিরিয়া আসে। নির্মেঘ আকাশে নক্ষত্রবধূদের নীরব অভিসার। গাছের পাতায় পাতায় একটা আসন্ন শীতের হাওয়ার অস্পষ্ট মর্ম্মর-ধ্বনি!···

মাঠের পুষ্করিণীর পশ্চিম পারটায় সেই সব ঘর-ছাড়া বুভুক্ষু কাঙালীদলের সাড়া পাওয়া যায়। স্থানটায় নানান্ জাতীয় ঘন পত্রবহুল গাছের সমারোহ। অল্পতেই ছায়াচ্ছন্ন, অন্ধকার হইয়া পড়ে।···

সাধুরাম লোকটা খোঁড়া। লাঠির ভরে টানিয়া টানিয়া সে এমনি উপযুক্ত আশ্রয়ের দিকেই প্রসাদের সঙ্গে নানা অবান্তর গল্প করিতে করিতে অতিরিক্ত ভিক্ষা সারিয়া ফিরিতেছে। শ্রোতা কতক তাহার কথা শুনিতেছে, কতক বা কানে তুলিতেছে না। আজ তাহার দিনের ভিক্ষা মিলে নাই। মনটা অপ্রসন্ন।···

আড্ডাস্থানের কাছেই, বেশী দূরে নয়, এমন সময় পায়ে কী একটা [illegible] ঠেকিয়া গেল!

ঃ আরে রাম রাম, সাধুরাম চম্‌কাইয়া এক হাত পিছাইয়া যায় ঃ বাপস্, কী অন্ধকার! দেখ ত' রে পেরসাদ, দেখ ত', পায়ে যেন কী—

ঃ কী খুড়ো, কী? সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদের ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর।

সাধুরাম ততক্ষণ সামলাইয়া লইয়া কী যে তাহাই বলিতে যাইতেছিল,—অমনি সহজ মীমাংসা হইয়া যায়। ঠিক পায়ের কাঁছেই একটা বাচ্চা শিশু ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

প্রসাদ তাড়াতাড়ি তুলিয়া কাহার বাচ্চা দেখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না। আড্ডাস্থানে কাহারা রাঁধিতেছিল, তাহারই আলোকে শিশুটির মুখ দেখিয়া চমকাইয়া যায়। শ্রীনাথ সকালে যাহার খাদ্য যোগাইয়াছে, দেখিতেছি এটি যে তাহারই মেয়ে!

সাধুরাম, প্রসাদ উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া সেই মেয়ে-লোকটার আক্কেল সরমের কথা নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত করে এবং ইহাতে শ্রীনাথকেও নানা কুৎসিতভাবে জর্জরিত করিতে থাকে।

বিস্ময়ের ব্যাপার, ঠিক এই সময়েই শ্রীনাথ আর উক্ত স্ত্রীলোকটিকে হাত ধরাধরি অবস্থায় সেখানে দেখা যায়। তাহারা পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিতেছে…

সাধুরাম আর প্রসাদের দল যেন চড় খাইয়া মুখ বুজিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকে। ভাবিয়া পায় না, শ্রীনাথ আর এই স্ত্রীলোকটির এমনি উলঙ্গ নির্লজ্জতার শাস্তি তাহারা কি দিবে।

স্ত্রীলোকটি সহসা প্রসাদের হাত হইতে শিশু মেয়েটাকে টান মারিয়া লইয়া নিজের কাঁধে ফেলিয়াই হন্ হন্ করিয়া সম্মুখের অন্ধকারের শূন্যগর্ভে মিলাইয়া যায়!

সাধুরাম শুধু অস্ফুট স্বগতোক্তি করে ঃ তাজ্জব কাণ্ড!

শ্রীনাথ তখন নিজের ঝোলা খুলিয়া নির্ব্বিকার গঞ্জিকার কলিকাটি বাহির করিতেছে!...

শনিগ্রহ

সবে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া বেলা তিনটা নাগাদ অন্নস্পর্শ করিয়াছি এমন সময় ভিতর উঠানে কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল একটি স্ত্রীমূর্ত্তি।

খাইতে যেখানে বসিয়াছি, সেস্থান হইতে উঠানের সর্ব্বাংশই চোখে পড়ে। স্ত্রীমূর্ত্তিটি দেখিয়া মনে হইল, সে যেন এইমাত্র কোন প্রেতলোক হইতে উঠিয়া আসিল। বসন বলিতে কটিদেশে একটু জড়ানো ছাড়া, আর বড় কোথাও নাই। ঊর্ধ্বদেশটা একেবারে উলংগ।

দেখিয়া কেমন যেন একটা লজ্জা করিয়া উঠিল! ইহার কোলে দেড় বছরের একটি শিশুও যেন আধ-মড়ার মত ঝুলিতেছে!

স্ত্রীমূর্ত্তিটি দোরের কাছে উঁকি মারিতেই একেবারে মুখোমুখী পড়িয়া গেলাম।

সে প্রথমেই অব্যর্থ বাণ ছুড়িল। কাঁদিয়া বলিল ঃ বাবু, দোহাই তোমার, তোমার পাতের একমুঠো ভাত...চারদিন খাই নি। বাবু, বাঁচাও, তোমার ভাল হোক, তোমার সুমতি হোক্, বাবু, বাবু...

আর বলিতে হইল না। গিন্নী তীরবেগে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন ঃ রাক্কুসী, হতভাগী...আবার এসেছিস জ্বালাতে! যা যা,

বেরো শীগ্‌গির, বেরো, মানা করে দিয়েছি না আসতে! একমুঠো ভাত কোথা থেকে আসে তা জানিস ?—

একদিন হয়ত জানিত, কিন্তু সম্প্রতি চাউলের দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যের বাজারে সে হয়ত ভুলিতে বসিয়াছে। আজ ইহার যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়না, তাহাতে কোন প্রকার জানা না-জানার অবকাশ নাই। এমনি একটা ভাবনা সহসা যেন আমাকে পাইয়া বসিল। আশ্চর্য্য, অনেকদিন হইতেই ত' ভিখারী শ্রেণীর এমনি দৈন্যদশা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কৈ, আজকের মত এমন চিন্তা ত' আমাকে পাইয়া বসে নাই ইহাদের জন্য! মনে হইল, তাই তো, ইহারাও ত' মানুষ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব, তবে কে ইহাদের এমন দশা করিল! মুখে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই থাকিবার আস্তানা নাই, মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ নাই, কোন বাড়ীতে গেলে শুধু দূর দূর, ছাই ছাই, এমন কি দৈন্যদশায় পড়িয়া আত্মবিক্রয়—এই যাহাদের জীবনের দৈনন্দিন নিগ্রহের ইতিহাস, তাহাদের সান্ত্বনা দিবার বা বাঁচাইবার ব্যবস্থা কাহার হাতে? ইহারা কি শুধু মরিবার জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে? কোথায় ইহাদের জীবনের সার্থকতা? ··

ঃ ওকি, হাত তুলে বসে আছ যে? গিন্নীর কথায় হঠাৎ চমক্ ভাংগিল ঃ খাবে না?

ঃ না, ক্ষিধেটা আজ যেন তেমন,—আমি মিথ্যা করিয়া আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বলিলাম · মানে পথে এক বন্ধু মানুষ খাইয়ে দিলে কিনা! তাই ভাবলুম, বাড়ীতে আর কিছু খাব না, তা' তুমি···

ঃ কি আমি? গিন্নী বলিলেন ঃ না খেলে রাগ করতুম, না জোর করে গেলাতুম? কখখনো না···সে দিন আর নেই। হয় নিজে খেতে খেতে, নয়তো তুলে রেখে দিতুম। রাত্তে খেতে একেবারে।

: তা তো হ'ত, কিন্তু এখন ? এ যে এঁটো হয়ে গেছে! বলিয়া আমি নিরুপায়ের মত তাঁহার দিকে চাহিলাম।

: ' এঁটো হয়ে গেছে শুনিয়া গিন্নী যেন স্তব্ধ হইলেন। শেষে কি একটা উপায় ঠাউরাইয়া বলিলেন : তবে আর কি, আমার ত' খাবার উপায় নেই। দাশ-বাড়ীর ছেলের অন্নপ্রাশনে খেতে বলে গেছে, এখুনি যেতে হবে। ঢেকে রেখে দি, রাতেই খাবে তুমি।

: বল কি! বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলাম, এ যে নাড়া-চাড়া হয়ে গেছে! গরমে নষ্ট হয়ে উঠবে ত'!

: তাও ত বটে! গিন্নী যেন নূতন করিয়া সমস্যা সমাধান করিতে বসিলেন।

আড়ভাবে চাহিয়া দেখিলাম, ভিক্ষুকীটি চোখ মুছিয়া সতৃষ্ণভাবে আমাদের উভয়ের কথোপকথন গিলিতেছে।

কিছুক্ষণ কাটিল। খুব যেন একটা সমস্যার মীমাংসা হইল এমন ভাবে বলিলাম : ওগো, এই ঠিক হয়েছে। মেয়েলোকটিকে ডাক, ওকেই দিয়ে দি। চারদিন খায় নি খেয়ে বাঁচুক্—

গিন্নী শুনিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমি থালা ধরিয়া ভিখারিণীর মাটীর মালসার উপর সব ঢালিয়া দিয়া আসিলাম।

গিন্নী তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পেটে ক্ষুধা আমার অনির্বাণ জ্বলিতে লাগিল সত্য কিন্তু নিজের ক্ষুধার অন্ন অন্য ক্ষুধিতকে খাওয়ানোর মধ্যে যে শান্তি ও উদারতা আছে, তাহার সবটুকুই বোধ হয় নেপথ্যে দেবতা আমার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।...

হঠাৎ কিছুকাল পরেই একটা গগনভেদী আর্ত্তকণ্ঠে চম্‌কাইয়া উঠিলাম।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া আসিতে হইল।

গিন্নী পূর্ব্বেই হাজির হইয়াছেন।···

আমিও দেখিলাম।

যে, ভিক্ষুকীকে আদর করিয়া এইমাত্র মুখের গ্রাস তুলিয়া দিয়াছিলাম—সেই এক্ষণে সম্মুখের দিকে হাত পা ছড়াইয়া জটার মত চুল এলাইয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ইহারি অদূরে তাহার ক্ষুধার অন্ন একটা ততোধিক ক্ষুধার্ত্ত কুকুর নির্ব্বিকার সবটা খাইয়া লইয়া এখন শুধু শূন্য মালসাটি চাটিতেছে।

দেড় বছরের রুগ্ন শিশুটি নিজের শীর্ণ একটা আঙ্গুল চুষিতে চুষিতে সেইদিকেই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

গিন্নীর চোখে সব মিলিয়া বুঝি অসহ্য হইল।···

বলিতে লাগিলেন: পোড়াকপালি, আঁটকুড়ী, এতগুলো ধরা ভাত তুই কুকুর দিয়ে খাওয়ালি! তোর কি আক্কেল নেই, অ্যাঁ? যা বেরো, শীগগির বেরো আমার বাড়ী থেকে। ভাল বুঝে মানুষকে ভাত দিতে গেছে! যেমন ভাঙ্গা-দশা···ইত্যাদি ইত্যাদি!

আমি তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীবৎস চিন্তামণির শনি কর্ত্তৃক নিগ্রহের উপাখ্যানই চিন্তা করিতেছিলাম।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ

কোন মফঃস্বল টাউনের সদর হাসপাতালের দিকে টলিতে টলিতে চলিয়াছিল লোকটা। বাঁ হাতে তাহার শূন্যগর্ভ দুইটি ছোট ছোট কাঁচের শিশি।

লোকটাকে দেখিয়া হঠাৎ চেনা চেনা মনে হইল: আমাদের শশীনাথ না?

লোকটা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুখ তুলিয়া ক্ষীণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলিল: আজ্ঞে,··· বাবু!

তুমি-ই!··· ইহার অতিরিক্ত একটা কথাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। বাস্তবিক আমার চোখ দুইটি যেন প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না যে এই সেই শশীনাথ!

লোকটার কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মাস দুয়েক আগে উহাকে একবার দেখিয়াছিলাম। রঙটা কালো বটে, কিন্তু সে কী উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা!—আবলুষ কাঠে যেন কুঁদিয়া তোলা গ্রীক ভাস্কর্য্যের ছাঁচে! পথ চলিবার কালে তাহার হাত পা আর বুকের মাংসপেশীগুলি যেন স্ফীত চাঞ্চল্যে তরংগায়িত হইয়া উঠিত বিক্ষুব্ধ নদীর মত। দেখিয়া যেমন চমক লাগিত, ভয়ও করিত।

সেই শশীনাথ আজ চোখের উপর কয়েকখানা হাড়ের সমষ্টি! শিরা-বহুল পেশীগুলি স্থানে স্থানে কুঁচকাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদেহ যেন কাহারো হাতে আগুনের সেঁকা দিয়া পুড়ানো। ইহা যেন শশীনাথের প্রেতায়িত ছায়া!

লোকটা নাম স্বীকার না করিলে হয়ত আর কথাই বলিতাম না।

এবার সে করুণভাবে নিজেই বলিতে লাগিল: বাবু, আর বুঝি বাঁচলাম না!···পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে ঘাড়ে কা-যে 'লটক্' লাগল

বাবু, তার পরে ত' বিছানায় শুয়ে। ব্যথা গিয়ে দাঁড়াল বাতে.···সঙ্গে জ্বর। বাতজ্বরেই খেলে বাবু!···ক'দিন থেকে আবার শুকনো কাশি, মাঝে মাঝে ছিটে ফোঁটা রক্তও ওঠে, ভারী দুর্ব্বল হয়ে গেছি বাবু···

ঃ তা ত' হবেই হে, বলিয়া এক পা পিছাইয়া সাবধান হইয়া পুনরায় বলিলাম ঃ কিন্তু কিছু ভাল ওষুধপত্র, পথ্য-টথ্য করছো ত' ?

শশীনাথ একগাল শীর্ণ হাসিল ঃ তবেই হয়েছে!···বলে, 'চা'ল নেই চুলো'—! টাকা কোথায় বাবু, যে ওষুধ পথ্য হবে? তায় চাদ্দিকে যে যুদ্ধের আক্রার বাজার!···বলুন ত'. ৩৬৲ টাকা মণের চাল খাইয়ে পরিবারই বাঁচাবো না আমার যোগাল হবে?

ইহার জবাব না দিয়া অনেকটা বোকার মত বলিলাম ঃ কেন, শুনেছি না তোমার অনেক টাকা।

শশীনাথের আবার তেমনি হাসি, বলিল ঃ ভুল শুনেছেন বাবু! থাকলে কে আর বনবাদাড় ভেঙ্গে এই দুইকোশ পথ হেঁটে আসে, বলুন?

ঠিক কথা। মনে মনে যেন কিছু লজ্জিত হইয়া গেলাম।

ঃ আচ্ছা, আজ তবে আসি, বলিয়া আমি তাহার নিকট বিদায় লইতে গেলাম, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া সহসা মনে হইল, সে যেন আরো কিছু বলিতে চায়।

ঃ কিছু বলবে নাকি হে?

শুনিয়া শশীনাথ যেন সংকোচে জড়াইয়া গেল। কোন মতে কাটাইয়া উঠিয়া বলিল ঃ বাবু বুঝি বাজারের দিকে যাচ্ছেন?

ঃ হ্যাঁ, কিছু বিস্মিতভাবে বলিলাম ঃ কিন্তু কেন বল ত'?

শশীনাথ এবারো কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ঃ বিপিন সা'র দোকানে শুনলাম কন্‌ট্রোলে আটা দিচ্ছে। এক সপ্তাহের উপর

একটা দানা না পরিবারের কারো মুখে। তাই ভাবলাম, চালের বদলে যদি কিছু সস্তায় আটা পাওয়া যায় এই সময় ত' ছেলেমেয়েরা দু'একখানা খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে কান্নাটা কিছু কমাবে। তা' দেখুন, এই শরীর, আর কোথায় বা টাকা! সদরে ওষুধ ত আমাকে নিতেই হবে, তাই আসতে আসতে মনে করলাম, অমনি কিছু আটাও নিয়ে যাই। আবার শুনলাম নাকি, কন্‌ট্রোল আটাতে অনেক ঝক্কি। মারামারি, টানা-হেঁচড়া আর দাঁড়িয়ে থাকা। তাই বাবু, আমি বলছিলাম কি—

শশীনাথ এখানে একটু থামিয়া দম লইয়া আবার বলিল : আপনি আমার জানা পরিচিত লোক। এই সময় আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন—

আমার দেরী করিবার উপায় ছিল না। একটু তাড়া দিয়াই বলিলাম : উপকারটা কি তাই বল না?

লোকটি ততক্ষণ কোঁচার খুঁট হইতে অতি জীর্ণ কাগজের টাকাটা বাহির করিয়া আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। বলিল : এই ধরুন। কিছু আটা,—যা হয়।... আমার উপকারটা করুন বাবু!

শশীনাথের কণ্ঠে যেন করুণ মিনতি আর বেদনা ঝরিয়া পড়িল।

এখন কথা হইতেছে যে এই লোকটার উপকার করিতে গিয়া কন্‌ট্রোলের দোকানে আমাকে যতখানি সময় ও ধৈর্য্য খোয়াইতে হইবে, প্রকৃতপক্ষে ততখানি খোয়াইবার আমার বর্ত্তমানে উপায় নাই। দুইদিন হইল আমার কয়েকজন শ্যালক ও শ্যালিকা আসিয়াছেন। ঘণ্টা চারেক বাদে তাঁহারা স্বস্থানে চলিয়া যাইবেন। সুতরাং এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইবে। শ্যালিকাদের জন্ত এক থান ব্লাউজ পিস, ভাল দেখিয়া একটি মাছ, কিছু মাংস, কিছু আলু-পটল এবং আরো আনুসংগিক যাহা কর্দ্দগত করা আছে, তাহা

কিনিয়া জের মিটাইতে ও ঘরে ফিরিতে ঘণ্টা দেড়েক ত বটেই! তারপর আছে গিন্নীর হাতের পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্না!...

ভাবিতেই দিশাহারা হইয়া গেলাম। হঠাৎ কঠোর ভাবে বলিয়া উঠিলাম: হবে না হে, হবে না, আমার অনেক কাজ, বুঝলে? আমি চললুম।—বলিতে বলিতেই দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম। আর পেছনে চাহিলাম না।

শশীনাথ হয়তো তখন নিজের পরিশ্রান্তিতে প্রবলভাবে কাশিতে সুরু করিয়াছে। তাহার কোনরূপ কথাই আমার কানে ভাসিয়া আসিল না!...

জব্দ

লোকে বলে গোরাচাঁদ পাগলা। লোকটা নাকি টাকার কুমীর।

এমনি দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। বেঁটে আর শীর্ণাকৃতি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। ভাঙ্গা-চোরা মুখ যেন সারাক্ষণই দাড়ি-গোঁফে কদমফুল। পরিধানে গেরুয়া রঙের একখানা দু'হাতি ধুতি, আর গায়ে শাদা আধ-ময়লা একটি ফতুয়া।...

এমনি আকৃতি আর বেশের যেন পরিবর্ত্তন নাই। বেশী শীতে শুধু একটা বালাপোষের ব্যবস্থা আছে। গোরাচাদ অনেকদিন বিপত্নীক। চারটি ছেলে। তাহারা সকলেই বিবাহিত। কিন্তু বেশে, চালে, চরিত্রে তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। কাহারো ভাল আয় নাই। অথচ ব্যয়ে শূন্য সঞ্চয়ের উপর এক কাহন! তাহারা অতিরিক্ত বাবু, বিলাসী আর অসংযমী।..

'গোরাচাঁদ ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া মাঝে মাঝে আপন মনে হা-হা করিয়া হাসে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। ছেলেরা অনেক সময় পিতার সুদৃঢ় লোহার সিন্দুকের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকায়। কখনো অনন্যোপায়ে হাতও পাতিতে যায় কিন্তু পিতা হাঁকাইয়া দিয়া বলে : যাঃ যাঃ বেটা! যেমন আছিস্ থাক। তোর বাপের হোটেলে খাওয়া পরার ত এমন কিছু অনটন ঘটে নি এখনো!..

ছেলেরা চুপ।

গত বছর বড় ছেলের বৌটি মারা গিয়াছে। আগামী পরশু তাহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ

গোরাচাঁদ নাকি কথা দিয়াছে, এবারকার শ্রাদ্ধে সে মোটামতই ট্যাঁকা কিছু দিবে। কেন না, বড় বৌ নাকি ছিল সাক্ষাৎ মূর্তিমতী লক্ষ্মীশ্রী!

টাকার পরিমাণটা না শোনা গেলেও পিতার কথার ভরসাতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল ছেলেরা। কোথাও কোন ত্রুটি তাহারা রাখিবে না।' ...

নিজেদের গচ্ছিত পুঁজিপাটি যাহা ছিল তাহা দিয়া, আবার কোথাও বা ধারে কাজ চলাইয়া তাহারা দ্বিজ আর দরিদ্র নারায়ণের ভোজন ও দক্ষিণার ব্যবস্থা করিল। রাশি রাশি শাদা কাপড়ের থান, আলু, পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, বেগুন, দধি, দুগ্ধ আর মণ্ডা মিঠাই—ভাঁড়ার ঘরে জমা হইতে লাগিল—পর্ব্বতাকারে। দেখিয়া লোকের চক্ষুস্থির।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। আগামীতে কিছু রাত থাকিতে শ্রাদ্ধাদির কাজে হাত না দিলে এত বড় ঘটা শেষই হইবে না হয়তো।

ছেলেদের এই মতে পিতাও মত দিলেন।...

রাত থাকিতেই কাজ আরম্ভ হইল।

একটু বেলা বাড়িবার সঙ্গেই লোকজনেব আনাগোনা আর চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। হঠাৎ কিছু টাকাব দবকার পড়িল। অথচ এমন হইল যে ছেলেদের বা অপর কোন মেয়ে-বৌদেব হাতে একটি কপর্দকও পাওয়া গেল না। সবাই যেন সময় বুঝিয়া রিক্ত হইয়া বসিয়াছে। এখন একমাত্র পিতার তহবিল।

পিতার খোঁজ হইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে আশে পাশে, শেষে চতুর্দ্দিকে…

নাঃ, গোরাচাঁদ কোথাও নাই।

ছেলেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! শেষটায় ভরা-হাটে এ কি পাগ্‌লামি!

একজন বেগতিক বুঝিয়া রাগে পিতার লোহার সিন্দুকেব তালা কৌশলে ভাংগিয়া ফেলিল।

কিন্তু এত বড় সিন্দুক, খালি। শুধু পুবানো ঝুলমাখা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েক টুকরা কাগজ!…সিন্দুকেব বৃহৎ গহ্বরমুখে একটা নিরবলম্ব শূন্যতা পাগলের হাসির মত যেন ব্যঙ্গ করিয়া হা-হা হাসিতেছে।

তাহা হইলে বানিয়াতীবুদ্ধি গোরাচাঁদ শুধু নিজেই অন্তর্ধান হয় নাই, সেই সঙ্গে টাকার ভাণ্ডটিও সরাইয়াছে!

ছেলেরা একসঙ্গে হাহাকার করিয়া উঠিল!…

ইহারই ঠিক এক সপ্তাহ পরে গোরাচাঁদ পাগলাকে নিজের বাড়ীর স্বস্থানে তেমনিভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। আর শুধু মুখে বলিতেছে: কেমন জব্দ! কেমন জব্দ!!

সমাপ্ত